মানুষ গড়া

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আর্য্য পাবলিশিং কোং
পি ৫৭ রসা রোড সাউথ
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেশ চন্দ্র বর্ম্মণ
আর্য্য পাবলিশিং কোং
পি ৫৭ রসারোড সাউথ
কলিকাতা।

মূল্য
এক টাকা আট আনা]

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্কাফ প্রেস্,
১৫ নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

আমার অকৃত্রিম সুহৃদ

কুমার—শ্রী অরুণচন্দ্র সিংহের—

করকমলে

আমার শ্রদ্ধার দানরূপে

মানুষ গড়া

অর্পণ

করিলাম।

ভূমিকা।

আমি আন্দামান থেকে বার বৎসর দ্বীপান্তর বাসের পর ফিরে এসে প্রথম নারায়ণের ভার নিই, তারপর ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সালে প্রথম বিজলী বের হয়। এই নারায়ণ ও বিজলীর লেখাগুলি কুড়িয়েই "মানুষ গড়া" নাম দিয়ে আজ নতুন বই ভূমিষ্ট হ'ল। এই পদ্মলোচন নামধেয় কাণা ছেলেটিকে লোকালয়ে বার করবার সময়ে আমার দু'টো কৈফিয়ৎ আছে।

আন্দামানের নির্জ্জন কারাজীবনে যা' কিছু সঞ্চয় করেছিলাম সেই চিন্তারাশি দেশকে দেবার আমার একটা লোভ ছিল। এই লেখাগুলি অনেকটা সেই লোভের ফল, তাই এগুলির মাঝে আছে কিছু ঝাঁজ, কিছু অধীরতা, কিছু চাপল্য। এক কথায় আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা অনেক হ'লেও আমার মন তখনও ছিল তরুণ, তার বয়স তখনও কৈশোরের সীমা পেরয়নি।

দেশে ফিরে এসে আমি সেজদা'র কাছে তাঁর নতুন সাধনা গ্রহণ করি। এই যোগ সাধনার প্রথম আলো, প্রথম স্পর্শও আমাকে কম মাতাল করেনি। অশান্ত অসংযত মন-প্রাণ সেই আনন্দের প্রথম নেশায় অধীর হয়ে ভেবেছিল 'মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ'—এ অপূর্ব্ব সামগ্রী হেঁকে ডেকে জগত সংসারকে বিলাতে হবে। সেই নেশার অসংযমও এই লেখাগুলির মাঝে দেদীপ্যমান।

যা' কিছু আমি "মানুষ গড়ায়" বলেছি সবই যথার্থ, সবই ঠিক বটে, কেবল তার অন্তর্নিহিত সত্যটি একটু ছন্দহারা হয়েছে, বলবার ব্যাকুলতায় মাত্রা তার হারিয়ে গেছে। সংশোধন করবার সময়ে আমি যথাসাধ্য এর ত্রুটি সারতে প্রয়াস পেয়েছি বটে, কিন্তু তবু সারা বইখানি ভরে তার রঙটুকু রয়ে গেছে।

আমার অনুরোধ এ বইখানি পড়তে গিয়ে অরবিন্দের নূতন যোগের সত্য এর মাঝে কেউ খুঁজবেন না, খুঁজবেন শুধু আমার কথা। অরবিন্দও

humanity",—আমার যোগ মানবজাতিরই জন্য,—এখনও এক হিসাবে সে কথা বলেন বটে, তার হিসাবটি কিন্তু বদলেছে। যোগ দূরে থাক, সকল প্রকার মহত্ত্বের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, দেশবন্ধু জাতিকে দেশলক্ষ্মীর স্বপ্ন দেখিয়ে মায়ের রত্ন-সিংহাসনের পাদপীঠ রচনা করে গেছেন, তিলক বিবেকানন্দ যে যার পথে হয়ে গেছেন অতুলনীয়। তা' বলে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা, দেশবন্ধুর বিপুল হৃদয় ও মনীষা, বিবেকানন্দের স্বাত্বিক তেজ ও ব্যক্তিত্ব এবং তিলকের কূট রাজনীতিজ্ঞান সকলের মাঝে সম্ভবে না। ভগবান তাঁর বিশেষ বিভূতি প্রকাশের জন্য বিশেষ আধার গড়েন। তাঁর জগত বড়ই বিচিত্র, তা'তে আছে নানা থাক, বহু শ্রেণী, অগণ্য গোষ্ঠী, অসংখ্য জাতি বিভাগ। তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য ফোটাবার জন্য এই বহুবিচিত্র সৃষ্টির মাঝে রকম বেরকম মশলা দিয়ে তিনি মানুষ গড়ে গড়ে আনছেন। তার মাঝে সবাই যোগী নয়, সবাই বীর নয়, সবাই কবি নয়, সবাই কর্ম্মী নয়, এই বহুমুখী সমৃদ্ধ নাট-রচনায় প্রত্যেক মানুষটির আছে দাঁড়াবার বিশেষ স্থান, করবার বিশেষ কাজ, ফোটবার বিশেষ ভঙ্গী।

মানুষ গড়ায় আমি যে রকম মানুষের ইঙ্গিত করেছি তা' হয় লক্ষে দু' একটী। তবু এক হিসাবে তাই ই মানব জাতির চরম লক্ষ্য। বহু জন্মজন্মান্তরের মধ্যদিয়ে প্রত্যেক মানুষটি চলেছে ভগবানকে প্রকাশ করবার দিকে, তিলে তিলে বটে কিন্তু পূর্ণঐশ্বর্য্যে, তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায়। To manifest the divinity within—অন্তস্থ দেবতাকে রূপ দেবারও আবার আছে ক্রম, অধ্যায়, যুগ-সত্য। প্রত্যেক যুগে সকল অতীত যুগের ফোটা দলগুলি নিয়ে এই মহাপদ্মের আর একটি নূতন দল ফোটে এবং সে সত্যের মহাকমল ফোটে দু'চারটি বিশেষ আধারে, কিন্তু তার গন্ধে আমোদ করে সারা জগত, তার মধুতে জুড়ায় বহু মধুকর, তার

সাধনা রূপ নেয় সে জাতির অতি-মানবে এবং সে সূর্য্য উদয় হয়ে জ্যোতি বিলায় সমস্তটি জাতির সত্তা জুড়ে। তার ফলে মানবজাতির মাঝে হয় অনেক কিছু পরিবর্ত্তন, অনেক সম্পদ বাড়ে, অনেক নূতন শক্তির তড়িৎ খেলে যায় পুরাতন আধারে, হয়তো সভ্যতা নূতন করে গড়ে ওঠে। এইখানে My yoga is for humanity খুবই সত্য। তা' বলে সমগ্র মানবজাতি হয়ে যাবে দেবতা, আবালবৃদ্ধ বনিতা সবাই হয়ে উঠবে অতিমানব, এ রকমটি সম্ভব নয়। দু'চার দশ জন অতি মানব হতে পারে, আপাততঃ তাদের সত্তার মাঝে একে একে মন প্রাণ ও দেহ এই তিন ভূমি জুড়ে যদি উপরের সত্য রূপ নেয় তা' হ'লেই এক হিসাবে সবারই জন্য পথ হ'ল, দেবলোক ও মর্ত্ত্য লোকের মাঝে স্বর্ণসেতু নির্ম্মিত হল, মানুষের ক্রমবিকাশ evolution আর এক পদ এগিয়ে গেল। একমাত্র এই হিসাবেই সকল মহাপুরুষ সফল ও সার্থক; নহিলে আচণ্ডালে প্রেম বিলিয়েও শ্রীচৈতন্য সে দুর্ল্লভ বস্তু আপামরকে দিয়ে যেতে পারেননি, একটি বই দু'টি শ্রীচৈতন্য হয়নি। তাঁর পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে শুদ্ধ মহাপ্রেম পাবার পথটি তৈয়ারী হয়েছে মাত্র এবং দু' দশ জন সে পথে এগিয়ে গিয়ে তা' পেয়েছে এবং চেষ্টা করলে আজও পায়।

ভগবানের সৃষ্টি দিব্য ক্রম কেউ উল্টে দিতে পারে না, অধিকারীভেদ হচ্ছে সে সৃষ্টির ধাপ ক্রম তাঁর গড়া সে অধিকারী ভেদ তাঁরই ভ্রূভঙ্গে নাকচ হতে পারে। এই অধিকারীভেদই সৃষ্টির মূল কথা, এ ভেদ কারও উন্নতির অন্তরায় নয়, এটি হচ্ছে পূর্ণত্বের সৌধশিখরে ওঠবার আরোহণী,—ধাপে ধাপে উঠে গেছে মানুষের মোটা স্থূল অজ্ঞানের রূপ থেকে জ্ঞান-শক্তি-আনন্দের উত্তুঙ্গ চূড়ায়।

পণ্ডিচারী।
১লা বৈশাখ, ১৩৩৩

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব্ব

মাতৃরূপ।

বিষয়		পৃষ্ঠা
মাতৃরূপ	...	৩
সন্তানের মাতৃদর্শন	...	৮
ভারতের কালীপূজা	...	১২
মাতৃবোধন	...	১৪

দ্বিতীয় পর্ব্ব

মরণ মঙ্গল।

মরণের চেয়ে বড় সত্য নাই		২১
শব কাঁধে শিব	...	২৭
সত্যমেব জয়তে নানৃতম্		৩০
মনের মরণ মনের বাঁচন		৩৪

তৃতীয় পর্ব্ব

জীবনের ভীত।

বাঁচার মত বাঁচা	...	৪১
মানুষের আত্মঘাত	...	৪৫
আমাদের জীবনের ভীত		৫৯
সত্যকার ডিমোক্রাশী	...	৫৩
স্বরাজ	...	৫৭

চতুর্থ পর্ব্ব

মনের রূপান্তর।

অহং বাবাজীর আখড়া		৬৫
অহং কারী কে	...	৬৯
অহংকার যায় কিসে?		৭৪
মনের ওপরের কথা	...	৭৭

পঞ্চম পর্ব্ব

নূতন মানুষ।

		পৃষ্ঠা
মানুষের জোয়ার	...	৮৭
কাণ্ডারী বই	...	৯৪
চারণের গান	...	৯৭
মানুষের ডাক	...	১০০
সুন্দরের পূজা	...	১০৫

ষষ্ঠ পর্ব্ব

নর-নারায়ণ।

নরনারায়ণ	...	১১৩
ত্যাগ না ভোগ	...	১১৬
মানুষের কপালের ত্রিনেত্র		১১৯
নব যুগের জীবন সঙ্কেত		১২২
নতুন সৃষ্টির বেতারা খবর		১২৫
ভাগবত জীবনের ভিত্তি		১২৮
আনন্দ নগরে যাহার বাস		১৩২

সপ্তম পর্ব্ব

নারীর দেবীত্ব।

নারীর পথ	...	১৩৭
নারীর জীবন সত্য	...	১৪২
নারী কেনদেবী	...	১৪৭

অষ্টম পর্ব্ব

সত্যের পথ।

চারিবর্ণের নারায়ণ	...	১৫৫
সাধন সত্য	...	১৫৯
সাধন সমরে	...	১৬২
মায়ার সেনা	...	১৬৬
প্রলয় পয়োধি জলে	...	১৭০
বৃহতের ডাক	...	১৭৪

মানুষ গড়া

প্রথম পর্ব

মাতৃরূপ
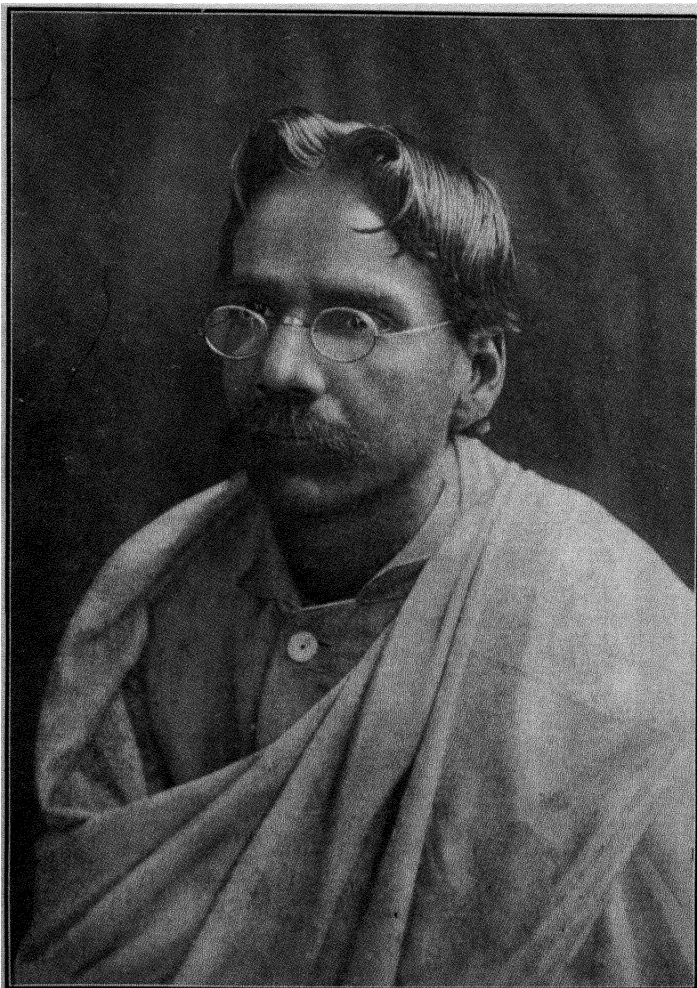
শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।

মাতৃরূপ

কমলাকান্ত দিন গণেছিল,—সোণার সিংহাসনে দেশ-লক্ষ্মীর রাজরাণী রূপ দেখবার জন্যে, সেই ব্রাহ্মণ দিন গণে-ছিল। দিন গুণে গুণে জীবনের শেষে বড় দুঃখে সে বলে গেছিল, "বিধি মিলাইল কই" ?—যাহার জন্য দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বর্ষ হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দি হয়, সে মানস-প্রতিমা বিধি মিলাইল কই ?" শুধু কমলাকান্ত নয়, কত যুগে কত জনই এই শ্যামার কোলে এসে ভবিষ্যতের দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে দিন গণে গেছে। ধূমঘাটের সেনা-তরঙ্গে একদিন প্রতাপাদিত্য এমনি করে দিন গণে গেছিল, পলাশীর আম বন, গঙ্গাজল, পথ ঘাট কাঁপিয়ে সিরাজদ্দৌলা ও ইংরাজের তোপ, আর এক

দিন এমনি করে দিন গণেছিল। তার পর কমলাকান্ত দিন গণেছে, যমুনার তটে কবি বসে দিন গণেছে —

"তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা
গরজিল লয় পাইল ও।"

আনন্দমঠের সন্তান-সেনা বাঙলার পল্লীপথ, মাঠ ঘাট ছেয়ে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে মন্ত্রে দিন গণেছে, আগুনের আখরে আকাশ রাঙিয়ে যুগান্তরের শক্তিও মায়েরই জাগরণের আশায় আগমনীর উৎসাহে দিন গণেছে। তার পর অরবিন্দ, তিলক, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন সবাই সেই দিন-গণনার সাধক। তবু আজও এ গণনা ফুরাল না, এ তো ফুরাবার নয়, কারণ এই আমাদের সাধনা, এই আমাদের ব্রত। এই ভাবেই তিল তিল করে শক্তির তিলোত্তমা, সিদ্ধির তিলোত্তমা, জ্ঞানের তিলোত্তমা মা আমার জাগছেন, সন্তানের জীবন নিয়ে, সাধনা নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে, শক্তি নিয়ে সর্ব্বার্থ-সাধিকা জগত্তারিণী জাগছেন। তোমরা ভরসা হারিও না, দিন গণনা ছেড়ো না, আত্ম-সমর্পণে এ আগ্ন জ্বালিয়ে রেখো, এ হোম পূর্ণ কোরো। তোমরা ইন্ধন, মা আমার অগ্নিশিখা; তোমরা বসন্ত-স্পর্শ, মা আমার কমলে-কামিনী; তোমরা কার্ত্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা, বাণী, কমলা; সকলকে নিয়ে মা আমার দশ-প্রহরণময়ী দুর্গা।

মাতৃরূপ

আমরা নব দিনে, নব মাসে, নব বর্ষে নিত্যই নূতন চাই। রূপ হতে রূপান্তর, সিদ্ধি হতে নব সিদ্ধি, তরঙ্গের পর নূতন তরঙ্গ—এই তো মায়ের রূপধারণ, তোমরা পুরাতনের পূজক হয়ো না, অচলায়তনের বন্দী হয়ো না, পথের মায়ায় ভুলো না। অনন্তের সঙ্গে তোমাদের বোঝাপড়া, অনন্ত এ অভিসার, সত্য হতে বৃহৎ সত্যের এ দীর্ঘ স্বর্গ-আরোহণী তোমাদের সকলকে পূর্ণত্বের স্বর্গে নিয়ে যাবে। সাহিত্যে কলায়, ধর্ম্মে রাজনীতিতে, সমাজে শিল্পে তোমরা নববর্ষের উৎসব সাজাও, নূতন হতে পরম নূতনকে বরণ করে নাও। সবই যে পথ, সবই যে শক্তির দ্যোতনা, মুক্তির পদক্ষেপ; সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেঙে ফেলে তোমরা জ্ঞান-বিজলীর ইঙ্গিতে এগিয়ে চল। এই আকাশের হাতছানি, আলোর অঙ্গুলী, সত্যের ঝিকি-মিকি বঙ্গের আকাশে দুই বৎসর দিন গণেছে, আজ আবার নূতন করে তার দিন গনণার পালা। তোমরাও এস, আজ দিন গণবে এস, নূতন মন্ত্রে চির-নূতনের দিন নূতন করে গণতে শেখ।

ভারতের জীবন-গঙ্গা যে পুরুষোত্তমের জটাবিহারিণী, তার সত্য অনন্তমুখী, তরল তার দ্রব অঙ্গ, মুক্ত তার গতি-প্রকাশ, বিপুল বিচিত্র তার তরঙ্গচ্ছন্দ, কূলপ্লাবী তার বেগ। শত সহস্র বিগ্রহের অঙ্গ ধুয়ে ধুয়ে সচন্দন পিঙ্গল সে জলরাশি,

একজনের মুখের শাঁখে শাঁখে নামে না; সে আসে সত্যের কৈলাস-চূড়া থেকে, বয় সাগরে। মহান বিরাট শান্ত সমুজ্জ্বল থেকে তার উদ্ভব, আর অকূল অগাধ নীল অনন্তে তার বিস্তৃতি। সে জীবনের বিচিত্র লীলাজলে বাঁধ দিতে নাই, গণ্ডী রচতে নাই; পিছনে তাকে মুক্ত রাখ্‌তে হয়, যাতে এঁকে বেঁকে বহু রঙ্গে, বহু বিভঙ্গে, নগর কানন পল্লী প্রাসাদ পূত করে, উর্ব্বর প্রবাহে বহু বেণী-সঙ্গম রচনা করতে করতে আপন সাগরে সে পূর্ণতা পেতে পারে।

নব দিন, নব মাস, নব বর্ষকে তোমরা ভয় করো না। পুরাতনকে ফুরিয়ে দিয়ে নূতনে জন্মাতে তোমরা কাতর হ'ও না। সেই তো প্রবাহ, সেই তো অমৃত, সেই তো মৃত্যুঞ্জয়তা, সেই তো অফুরন্ত শিবধাম—চূড়ার পর চূড়া, সত্যের পর সত্য, উদয়ের পর উদয়, সেই তো পরম সনাতনের চিরনবীনতা।

বিভীষিকায় আত্মহারা হয়ো না; এ শুধু তোমার সাধনের পরীক্ষা। উচ্ছিষ্ট সুখৈশ্বর্য্যের লোভে ভুলো না—পরপ্রসাদে কেউ ভূমার অধিকারী হয় না। একবার মনের সঙ্গে পাকা-পাকি বুঝাপড়া করে নিয়ে বলো—'ওরে মন হবেই হবে।' এ বঙ্গ-প্রতিমা মহাশক্তিকে ধ্যানে পেলে মরা আবার বেঁচে উঠে নবতনু গ্রহণ করবে; গঙ্গার তটে তটে আবার তাম্রলিপ্তি,

ধূমঘাট, সপ্তগ্রাম, নবদ্বীপ গড়ে উঠবে; বঙ্গ-সাগরের তরঙ্গ ভেদ করে রাজহংসীর মত বাংলার অর্ণবপোত আবার ছুটবে; বিশ্বের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার মায়ের পায়ে পড়ে আবার লুটবে। বিশ্বাস হারিও না।

সন্তানের মাতৃ-দর্শন

মাতৃহারা বাঙালী মায়ের রূপ দেখো। মা-হারা হয়ে এ দেশ শ্রীহীন ছন্নছাড়া হয়েছে, তাই বাঙলার মাটিতে আর সন্তান-দল জন্মায় না। কবে কোন্ কালে দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ দিয়েছিল, বাঙালীর শিব সেই শব বুকে তুলে কাঁধে করে এত শতাব্দি কত দ্যুলোক ভূলোক ঘুরলো, তবু সে সতীর মরা দেহে প্রাণ এলো না। শিব একদিন কৈলাসে বসে সতী-বিরহে অঝরঝরে কাঁদছিলেন, নারদের বীণার জ্ঞানদায়ী ঝঙ্কারে হঠাৎ তাঁর এ বুদ্ধিবিভ্রম দূর হ'য়ে গেল। তিনি দেখলেন—সতী মরে না, এই জীবন মরণের টালমাটালে মহাসাগররূপা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ময়ী এই শক্তি মরে না। যেখানে শিব সেইখানে সতী, যেখানে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য জয়-পরাজয় জীবন-মরণ সেইখানে মায়ের শিবা-অশিবা রূপ। সেই রকম এ দেশমাতাও চিরন্তনী, শ্যামা সজলজলদবসনা

গঙ্গা-যমুনা-মেখলা এ বরদা মাও মরে না। বাঙলার শিব যোগাসনে বসে নারদের বীণা গানে জ্ঞাননেত্র খুলে আবার সনাতনী মাতৃরূপ দেখেছে, নিজে দেখে সে অপরূপ রূপ বাঙলার হৃদয়-নারদকে দেখাচ্ছে; এই বলে দেখাচ্ছে, "দেখ বৎস, মায়ের ছবি দেখ; অজ্ঞানের বিভ্রমেই আমরা মা-হারা, জ্ঞানের উদয়ে সে পাগল মন সুস্থ হলে শান্ত যোগে আমরাই আবার দেখি—বিশ্ব চরাচর ছেয়ে মা-ই তো আমাদের চিরবিরাজিতা।

প্রেমের বীণা ফেলে দিয়ে জ্ঞান-পিপাসু নারদ তখন জ্ঞানরূপ মহাদেবের কাছে বলে উঠলেন—"দেখাও দেব, আমায় মা দেখাও, আমি জ্ঞানের মধ্যে শক্তিকে দেখে একবার শিবপার্ব্বতীর মিলনে নিজের প্রেম ও কর্ম্মের রূপ পূর্ণ করে পাই।" শিব তখন দৃষ্টির মায়া-আবরণ—নারদের চোখের ঠুলি খুলে দেয় আর অমনি নারদ দেখে শত শত দ্যুলোক ভূলোক গোলক ধরণী শিবের শরীরে গঙ্গার জোয়ারের মত প্রবেশ করছে। এইরূপ প্রলয়-তরঙ্গে গিরি নদী গাছ পালা সহর নগর সব শিব-অঙ্গে মিশে গেল, গিয়ে সামনে এক মায়াকাশের সৃষ্টি হ'ল। সেই অখণ্ড নীল মণ্ডলে দশধা বিভক্ত আগুনের রাশিচক্রে নারদ তখন দেখলে দশমহাবিদ্যার রূপ! কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, বগলা,

ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা! মা আমার বরাভয়করা নৃমুণ্ডধরা খড়গবিলাসিনী কালী, সেই মা-ই তো দেখ আবার বাঘ ছাল পরে জটায় ফণী ধরে রক্তবরণা তারা! ভয়ঙ্করী সেই মা আবার জ্যোতির শ্রীঅঙ্গে হারকেয়ূরময়ী প্রেমের ছবি ষোড়শী আর পীনপয়োধরা চিরযৌবনা ভুবনেশ্বরী!! যে মা তোমার রক্তমাখা অঙ্গে ভৈরবী হয়ে রত্ন কিরীট মাথায় পরে দাঁড়াতে পারে, যে মা শাঁখের বালা পরে দুহাতে বীণা ধরে শ্যামাঙ্গী সাজে, মাতঙ্গীরূপে জগৎজন-মন ভুলায়, সেই মা দেখো আবার—

"অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তার বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥"

এই ত বর্ত্তমান বাঙ্গালার ক্ষুধাতুরা নগ্না গলিত-যৌবনা ধূমাবতী রূপ। সর্ব্বনাশী মা আমার দীনতার লীলায় মেতেছে, তার পর ছিন্নমস্তা হয়ে আপন মাথা কেটে সেই মাথা স্বহস্তে ধরে আপন ত্রিধারা রুধির মা আপনি পান করবে। শান্তা হউক, ভীমা হউক, আপনাকে নিয়েই তার কঠোর কোমল—ভীষণ মোহন দুই রকমই খেলা। আপন ঐশ্বর্য্য হরণ করে মা ধূমাবতী, আপন মুণ্ড ছিঁড়ে মা রক্তপানাতুরা ছিন্নমস্তা,

আবার সমস্ত বিশ্বের অকল্যাণ পান করে ফেলে সেই মা-ই দেখতে পাবে শেষে মরণ লীলার অন্তে মহালক্ষ্মী হয়ে বসবেন। তখন রাজরাজেশ্বরীর ঐশ্বর্য্যের আর অন্ত থাকবে না—

"সুবর্ণবরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষোম
স্বর্ণ ঘটে বারি করি শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা করে পদ্ম সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীব দুঃখ হরিছে॥"

দেখতে দেখতে তখন শিবের শরীর হতে দ্যুলোক ভূলোক গিরি নদী বন কান্তার মিলান স্বপ্নের মত পুনরুদিত হ'বে, মায়ের ভীমা কান্তা মোহিনী সুভগা ঐ দশটি রূপ একত্রে মিলে গিয়ে এক বিগ্রহে গৌরী রূপ ধারণ করবে। ঐ দ্বন্দ্বময় একই শক্তি জীবন মরণ পাপপুণ্য বন্ধন মুক্তি সবই; ঐ তোমার অন্তরস্থ জ্ঞান-পুরুষ শিবের অঙ্গে চিরদিনই এই শক্তির উদয় হয়। জ্ঞান বিনা শক্তি নাই, বঙ্গদেশও জ্ঞান-হারা হয়ে শিব শক্তি দুই-ই হারিয়েছে। তাই বলি জ্ঞান পেয়ে ত্রিনেত্র খুলে, ওগো সন্তান-সেনা, তোমরা একবার মাকে দেখ; মা-হারা দেশ একবার এমন ভুবনমোহিনী মায়ের অভয় কোল পাক।

ভারতের কালী পূজা

শিব তত্ত্ব, কালী তার শক্তি। শিব নির্ম্মল শান্ত সর্ব্বাধার তাই শুভ্র তার বর্ণ, ধ্যানস্তিমিত তার নেত্র, শবাসনে তার শয়ন। এই "সদেকং" জগৎকারণ ভগবানের একাধারে শিবা ও অশিবা শক্তিই কালী; এ শক্তি অনন্ত বলে কালো, ভগবানকে লুকিয়ে তার উদয় বলে শিবদলনী শিববক্ষবিহারিণী, অনন্ত দেবতার অফুরন্ত মাধুরী প্রকাশ করে বলে এই আছে এই নাই—অনিত্যা চিরনৃত্যরঙ্গিনী। ভেঙে ভেঙে ফুরিয়ে ফুরিয়ে সেই পরম সত্যকে তরঙ্গে তরঙ্গে ফুটিয়ে তোলে বলে এই নৃমুণ্ডধারিণী শ্যামা এমন মরণসাধা মেয়ে—মরে মরেই সে অফুরন্ত জীবন-গঙ্গা।

ভগবান জ্ঞান, কালী শক্তি; ভগবান আনন্দ, কালী লীলা—অনন্তম্ অনির্দ্দেশ্যমের কোলে সান্তা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী শ্যামা। শুধু শিব ভারতের রূপ নয়, শুধু কালী ভারতের রূপ নয়,

ভারতের কালী পূজা

শিবের বুকে কালী—ত্যাগের কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর ভোগের হৈম সিংহাসনই ভারতের পূর্ণরূপ। শুধু ভোগের কথা বিদেশীর কথা, শুধু শক্তির কথা জীবনের রাজপথের মাতাল য়ুরোপের কথা, আবার শুধু ত্যাগের কথাও এত দিনের মরা ভারতের মরণের কথা, শ্মশানবাসী ভূতের কথা। য়ুরোপ কালীকে চেনে, শিবকে চেনে না, তাই ওদের দেশভরে শুধু চামুণ্ডাই নাচে, মানুষের রক্তে মানুষের ইতিহাস লেখা হয়। ভারত শিবকে খোঁজে, শিবশক্তি জগদ্ধাত্রীকে চায় না, তাই ভারতের কমলা পরের দুয়ারে বাঁধা, ভারতের বীণাপানি সারদা পরের কমলবনে বীণা বাজায়, ভারতের দশায়ুধ-ধরা সিংহ-বাহিনী বিদেশী সিংহে চড়ে ভারতের শক্তি হরণ করে। ভারতের আসল কথা শিবদুর্গা, ভারতের জীবন সত্য শিবকালী, ভারতের রাজশ্রীর পূর্ণবিগ্রহ শিবশক্তি দুইই।

মাতৃবোধন

বলো, ভাই, আর একবার বলো—সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্যশ্যামলাম্ মাতরং। সহস্র দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে তবু মা আমাদের সুজলা সুফলা, তবু বঙ্গ-জননী সবার চেয়ে শস্য-শ্যামলা নদীহারমেখলা পূণ্যভূমি। দুই চক্ষুতে সহস্র নয়নের অতৃপ্ত আনন্দ নিয়ে এ মায়ের দিকে চেয়ে কখনও দেখেছ কি? কখনও পল্লীর শ্যাম দুর্ব্বায় তোমার অনশন-শীর্ণ চিন্তাতপ্ত দেহখানি লুটিয়ে অনুভব করেছ কি, কত শীতল, কত সন্তাপহারী, কত চন্দনসুরভিত সে স্পর্শ? এই মাকে হারিয়ে আজ আমাদের ঘরে অন্ন নেই, দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই, নয়নে জ্ঞানদীপ্তি নেই। মায়ের কোলেই আজ আমরা মাতৃহারা।

আমরা যদি অজ্ঞানে, আত্মস্বার্থে, চরিত্রের দৈন্যে মাকে না ভুলতাম, তা হলে অপরে কি আমাদের মা-হারা করতে

পারত ? আমাদের অন্তরে বঙ্কিমের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিতা চিন্ময়ী দেশ নেই—আছে শুধু মাটি। আমরা অন্নের কাঙ্গাল, বস্ত্রের কাঙ্গাল, টাকার কাঙ্গাল, ছোট ছোট ভোগের কাঙ্গাল —কিন্তু মায়ের কাঙ্গাল ত নই !

মাকে যদি অন্তরে পেতাম তা হলে পরাধীনতার সহস্র শিকল পায়ে পরেও বলতে পারতাম—

"কে বলে মা তুমি অবলে ?
বহুবলধারিণীম্
নমামি তারিণীম্
রিপুদল বারিণীম্ মাতরম্"

একবার চোখ খুলে দেখ ভাই সত্যই এই প্রতাপাদিত্য-জননী, হিমালেকিরিটিনী মা আমাদের দশায়ুধধরা সিংহবাহিণী শ্রীদুর্গা। তাই দেখে না সাধক বাঙ্গালী তন্ত্র রচেছিল, মায়ের দশমহাবিদ্যারূপ ধ্যানে পেয়েছিল বলেই না সাধক উচ্চকণ্ঠে গেয়েছিল—

"অভয় পদ কমলে
প্রেমের বিজলী জলে
চিন্ময় মুখ মণ্ডলে
শোভে অট্ট অট্ট হাসি।"

আজ আকাশে অমানিশার অন্ধকার ; গ্রামে গ্রামে আজ

মানুষ গড়া

মহাশ্মশান ; ফেরুপালের চীৎকারে আজ দিগন্ত মুখরিত ; ভুত প্রেত পিশাচের বিকট হাস্যে আজ সবাই ভয়ার্ত্ত—আজই তাই শব সাধনার প্রকৃষ্ট দিন। এস ভাই, শ্মশানে শ্মশানে শবের আসন বিছিয়ে এই আঁধার রজনীভরে শবশিবের বুকে শক্তির উদ্বোধন কর। মায়ের চিন্ময়ীরূপ দেখে আবার অজর, অমর, নির্ভয় হও। মৃত্যুভয়রূপিণী অবিদ্যাকে জয় করে মায়াধীশ পিণাকপানির বল ধর। তারপর দেখবে তোমার ভ্রুভঙ্গিতে প্রলয় হবে ; আর সেই প্রলয়পয়োধিজলে সৃষ্টির নূতন কমল মধুভরা বক্ষ মেলে ফুটে উঠবে। তোমার যশে তোমার মায়ের জয় জগৎভরে জাগবে।

তখন তুমিও বল্‌বে—'কে বলে মা তুমি অবলে ?' তখন তুমিও অধীনতার শোকতাপ, লক্ষ পাপ থেকে ত্রাণ পেয়ে বুঝবে যে এ মা সত্যই ত্রিতাপহারিণী, পতিতপাবনী, নারায়ণী। এ মাটির দেশ দেশ নয় ; এ যে কোটি তাপসের পুণ্যরক্তে গড়া, কোটি দেবমানবের সাধনশক্তির মূর্ত্ত দেবতা।

শিবের বুকে না জাগাতে পারলে যে এ শক্তি বন্ধনের শক্তি, ধ্বংসের শক্তি, প্রলয়ের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সত্যকার কালীর পূজক যে শিবের জাতি, অমৃতের পুত্র, অসুরজয়ী দেবতার দল। যার অন্তরে অসুর, বাহিরে অসুর, এ মায়ের খড়্গাই তার ললাট লিপি। যে কংসানিসূদন মধুকৈটভারি

দৈত্যজয়ী বীর, এ মায়ের খড়্গ তারই শঙ্কা নাশ করে, এ মায়ের বরাভয় তারই রাজপাট বিভবশ্রী রক্ষা করে। করালরূপিনী এ মা ভয়ভীতের মা নয়, নিখিলশক্তিময়ী এ মা বলহীনের মা নয়, সুরাসুরবিমোহিনী এ মা অজ্ঞানের মুর্খের মা নয়, অশিব মৃত্যুরূপা এ মা দীন ক্ষুদ্র পশুর মা নয়।

কৃষ্ণশিলার মত কঠিন এ ঘন নিবিড় কালরূপ—ব্যোমের মত যার বিস্তৃতি, জলধির মত যার শীতল-স্পর্শ ও গভীরতা, নীরদনীল যার অনুপম সুষমা, জগতকে কুক্ষিগত করে উদিতা সেই শ্যামা তোমারি প্রকৃতি, তোমারই সত্তার পাতালভূমি, তোমারই অপার জড় অঙ্গ। আলোর দেবতা হয়ে, সত্যের পরম পুরুষ হয়ে, শক্তির মহাশিব হয়ে একবার দেখ, তোমার সে সৃষ্টির নাভি-হ্রদরূপা তমোময়ী রজনীকে তোমারি অখণ্ড জ্যোতির মণ্ডলে তুমিই ধরে আছ। এ কালী তোমার শক্তির মর্ত্তলোক, অসুরজয়ে এ দেবীর প্রকাশ, শিব হয়ে তার রক্ত-চরণ বক্ষে ধরে এ শক্তির সম্বরণ। তোমার আমার এই শিব শক্তিময় পূর্ণরূপের প্রকটই ভারতের সত্যকার কালী পূজা।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

মরণ-মঙ্গল

মরণ-মঙ্গল

মরণের চেয়ে বড় সত্য নাই।

মরণের চেয়ে এত বড় সত্য আর কিছু নেই। সৃষ্টির নিয়ম এই, যে যত বড় মরণ মরতে পারবে সে তত বড় জীবন পাবে। আসলে আমরা যে পরম বস্তুর প্রকাশ সে অখণ্ড বস্তু ত কখন যায় না, শুধু মরণের মানস সরোবরে ডুব দিয়ে নতুন তনু, নতুন শক্তি ও নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে ফিরে আসে। তার ছোট্ট প্রকাশটুকুকে আমরা চিনি বলে সেই বউ ছেলে নাতি পুতির মত ছোট্ট ছোট্ট প্রকাশগুলি আমাদের কাছে এত মারাত্মক রকম আপন জিনিস হয়ে দাঁড়ায়, সেই নামরূপ-হারা জিনিষই রূপ নিয়ে আনন্দে আমাদের বেঁধে ফেলে, আমরা তার লোভে পড়ে গিয়ে তাকে হারাবার ভয়ে আকুল হই। যদি কখনও কোন উপায়ে, কোন শুভলগ্নে কোন অপূর্ব্ব দৃষ্টি পেয়ে একবার সবটাকে দেখতে পাওয়া যায় তা হ'লে

কোন ছোট জিনিষই আমাদের আর বাঁধতে পারে না। যদি দেখতে পারা যায়, যে, এক অনন্ত অসীম জগত বুকে করা সত্বাই তরঙ্গে তরঙ্গে রূপ নিচ্ছে, নিতুই নতুন হবার আনন্দে ক্রমাগতই ভেঙে পড়ছে, তা' হ'লে ছোট ছোট জীবন মরণ আমাদের সম আনন্দ দিতে পারে—তাদের মায়ায় আর বাঁধে না।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র দেহ মন হ'য়ে আমরা নিজের বড় স্ব-রূপ হারিয়ে বসে আছি; স্বর্গ আর মর্ত্তের মাঝের সোণার সিড়ি ভেঙে গেছে। মালার সূতো ছিঁড়ে গিয়ে দানাগুলো ছড়িয়ে গেছে। এখন ছোটকে ভুলে বড় হ'তে হবে, ছোটর মরণেই বড়র প্রকাশ, একবার চূড়ান্ত মরণ মরতে পারলেই চূড়ান্ত জীবন! কিন্তু মায়া কাটান বড় দায়, ছোট যে এখন নিতান্তই ধ্রুব, অখণ্ড স্ব-রূপ যে আমার কাছে এখন অধ্রুব! এমন হাতের লক্ষ্মী এখন কি করে পায়ে ঠেলা যায়।

কিন্তু বরাবর তাই করেই তো আমরা চলেছি। পরের জন্য মরতে পার বলেই ত তুমি দেশউদ্ধারী, পরের জন্য অস্থি দিয়েছিল বলেই ত দধিচির এত নাম! পরের হিতে টাকা কড়ি বিলিয়ে দিয়ে এ দেশের দুঃখিনী মেয়ের দুঃখে কেঁদে কেঁদেই তো বিদ্যাসাগর এত বড় হ'ল! এরই নাম অন্তর-শায়ী অখণ্ডের ডাক! এই ডাক শুনে—এই বাঁশীর সব-

মজ্ঞান সর্ব্বনাশা ধ্বনি প্রাণের কাণে পেয়ে মানুষ ছোটর মায়া কাটায়, মরতে মরতে বৃহৎ থেকে বৃহতে জীবন পায় ; তখন আর তার "নাল্পে সুখমস্তি।"

অল্প আর তাকে সুখ দিতে পারে না, দেহ মন স্বার্থ অভিসন্ধি সব ভেসে যায়, অন্তরটা হয়ে যায় দরাজ মাঠ। যেন হঠাৎ কে বাড়ীর চারিদিকের গাছপালা কেটে দিয়েছে, যেন সব ফাঁকা—ব্যোম, যেন কোথায়ও বাঁধন নাই, গণ্ডী নাই, কুণ্ঠা সঙ্কোচ লজ্জা নাই। দেহের মরণ সহজ, কারণ ১৪ টাকার সেপাই টাকার খাতিরে সে মরণ হেলায় মরে। কিন্তু যার কথা বলছি সে মরণ-সাধক তিল তিল করে পরের তরে বিশ্বের জন্য অখণ্ডের লাগি নিঃস্বার্থের মরণ নিষ্কামের মরণ মরতে পারে। এমন করে মরণ যার চরণের সাধা সহজ গতি তার জীবনের শেষ নাই। সেই মহামরণের—আপনাভোলা রুদ্র পূজকের শ্মশানে তখন নিত্যানন্দ বিরাজ করে, শূন্য তার জীবন অনন্ত জ্যোতির বিথারে ভরে যায়, জগচ্ছক্তি কালী তার বুকের পদ্মে সৃষ্টি-রচা চরণ দেয়, তখনিই ত নবযুগে শ্মশান-বিহারীর শক্তি-বোধন সফল হয়। তোমরা কি সেই শিব হবে না ?

"দুখ দানবের অত্যাচারে
ডাকছে জীব ত্রাহিত্রাহি

চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের
সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি।"

যে দিন বাঙলার আকাশ ভেঙ্গে ভগবানের হাতের বাজ মরণ-লীলায় ঘরে ঘরে নেমেছিল, সেই দিন এ জাতির প্রথম জ্ঞান এসেছে। সে জ্ঞান কিন্তু অভাব দৈন্যের জ্ঞান। যার দুঃখ বোধ জাগেনি সে জাতি যে তিল তিল করে পক্ষাঘাতের অসাড় মরণ মরছে বলতে হবে। তম অজ্ঞান অসাড়তাই পাপ, কোন জাতিই মরে না—যদি সে একবার কোন উপায়ে বুঝতে পারে, যে, সে জাতি হিসেবে কত বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের দুঃখী। অসাড় অবশ অচেতন শরীরে বিজলী হেনেই চেতনা আনতে হয়, সেই রক্ত-যুগের পর থেকে বাঙালীর অবশ অঙ্গ ব্যেপে তাই অভাব দৈন্ড বেদনার বোধ জেগেছে। কিন্তু এখনও পূর্ণজ্ঞান হয় নাই। সাড়া যদি একবার সত্য সত্যই সর্ব্ব অঙ্গ ব্যেপে আসে, তা' হলে কি আর এমন নিশ্চেষ্ট থাক্‌বার উপায় আছে? তা' হলে যে তাকে মরণ পণ করেও বাঁচতে হবে। তাই বলছি সেদিন রক্ত-যুগের রাঙা উষায় বাঙ্গালীর অসাড়তার মরণ ফুরিয়ে বেদনার মরণ আরম্ভ হয়েছে। তাই সেই দিন থেকে আর ভয় নাই।

দুঃখের অপার সাগর সুরাসুর মিলে মন্থন করে তবে না অমৃত পাওয়া যায়! কালো যমুনার কূলে আঁধার ঘনঘোর

রজনীতেই না কুঞ্জের বাঁশী বাজে। হে তুচ্ছ রঙ তামাসার হাসির লম্পট! তোমরা একবার দুঃখের কালো মাণিককে চিনতে শেখ; অশিবের রক্তের আলতা পরে সুখদুঃখের পারের কুঞ্জে অভিসারে যেতে শেখ; কুলনাশা পাপের সাঁদুর সিঁথায় পরে সে-বস্তু-সোহাগী হও।

যখন বিদ্যুতের চেতনাদায়ী স্পর্শে অসাড় অঙ্গে বোধ আসে তখন বেদনার বোধের সঙ্গে আত্ম-বোধও জাগে। আত্মভোলা জাতির হঠাৎ স্মৃতি ফিরে তাকে বুঝিয়ে দেয়, "আমি কে?" প্রলয়ের মাঝে পরম শরণ মহাজ্ঞান উদয় হয়—

"প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্"

প্রলয়ের অপার থৈ থৈ তরঙ্গ-পাগল কালো জলের মাঝে নিত্য-বেদ কে রক্ষা করে জান? বিজলীর প্রাণঘাতী ঝলকে বজ্রের কড়কড়ে কোন দেবতা জীবন-অমৃত বিলায় তা' কি বোঝ? যে ভালর ঠাকুর, যে আলোর ঠাকুর, যে পুণ্যের ঠাকুর তোমাদের পয়সার লোভে মন্দিরে মন্দিরে মুক্তি বেচে সে তো তোমারই বাসনার রূপ। তোমাদের দীনতা দিয়ে কাঙাল মনের কাঙালীত্ব দিয়ে সে মন-গড়া ঠাকুর তোমরা গড়েছ। তাই ত তোমরা সুখ দুঃখের পারের বরাভয়ধারী যুগের দেবতা চিনলে না। এ দিন দুনিয়াকে কাঁদায় কে?

মানুষ গড়া

কাঁটার বনে স্বর্গের পথ চেনায় কে ? সে যে প্রলয় পয়োধির বেদ-উদ্ধারকারী ভগবান। যার মনে ভগবান আছে তারই বাইরে বাইরে সব কৃষ্ণময়, যার মনে শক্তি আছে বাইরে তারই তো রাজপাট সম্পদশ্রী গড়ে উঠে, যে দেশবাসী জনে জনে মনের আগল খুলে উপরে অখণ্ড আনন্দ-জ্ঞান-শক্তির ঘর পেয়েছে তাদেরই দেশ তাদেরই জাতি-আত্মা পাষাণ থেকেও চিন্ময় বিগ্রহ ধরে জগতরক্ষায় বেরিয়ে আসে।

শবকাঁধে শিব

আজ আমাদের আঁধার নিশা অবসান হবে হবে হয়েছে। কবে কোন্ শতাব্দির আড়ালে এ জাতির জীবন-সূর্য্য ডুবেছিল, আজ তারই উদয়পাট ঘিরে বহুদিন পরে রঙ বেরঙের আলোর আভা খেলছে। বুঝি এবার কাল নিশ কাটে, বুঝি মরণের মুখে অমৃতের সন্ধান মেলে। যে মরণ আমরা মরেছিলাম সে কি যে সে মরণ। যে জাতি ভগবানের বিধানে মরে সে বুঝি এমনি সকলনাশা মৃত্যুই মরে! কারণ সে যে আত্মঘাতীর তিল তিল করে অপঘাতে মরা।

যে মরতে বসেছে ভয় তার জীবনের সহচর। তাই আমরা আজ ধর্ম্মভীরু, নীতিভীরু, সমাজভীরু, স্বার্থভীরু, যুক্তিভীরু, কিসের ভয়ে ভীরু নয়? ধর্ম্মের কণামাত্র নাকি সকল ভয় থেকে ত্রাণকরে; ধর্ম্মই জগত চরাচর ধারণ করে আছে, কারণ ধর্ম্ম সত্যমূর্ত্তি। আর আমরা যাকে ধর্ম্ম বলি

তা বাঁধে, ভেদ আনে, চলতে বারণ করে, নিষেধের পাহাড় গড়ে, আর এমনি করে পাথর চাপা দিয়ে দিয়ে তিল তিল করে মানুষকে জীবন্তে মারে। তার মানে আমাদের ধর্ম্ম নেই, ধর্ম্মের নামে যা যা আছে তা অপধর্ম্ম।

ধর্ম্ম যে সত্য, তাই ধর্ম্ম জীবনের উৎস, বসন্তস্পর্শে। ধর্ম্ম অনন্ত, তাই যুগে যুগে নব কলেবর ধরে জীবতারণে আসে, আবার জীবকে নতুন রূপ নেবার জন্যে আগুয়ান হতে ডাক দিয়ে সরে যায়; মানুষকে বাঁধে না, গণ্ডীর মাঝে বসায় না, মুক্তির মাঝে তরল জলের মত রেখে সে গণ্ডীকেটে সৃষ্টিকে রূপ দেয়। এ জগতে যারা বাঁচবে শক্তি জ্ঞানে আনন্দে মানুষ থেকে দেবতার পৈঁঠায় উঠবে, তারা সেই চির নূতনের ডাক শুনে চলে।

আর যারা মরবে তারা একটু আস্বাদ পেতে না পেতে অচলায়তন গড়ে তোলে, তারা ছাঁচ চায়, ট্রেডমার্ক চায়, দোকানদারী চায়। ভাল মন্দের পাগল তারা ক্ষুদে ক্ষুদে ভালর জন্য না পারে এমন অকর্ম্ম নেই, সত্যের তারা গুণ্ডা, স্বর্গের সত্য গায়ের জোরে তারা কায়েম করে ভাবে "আমরা সনাতন ধর্ম্মের রক্ষী।" তাই নূতনে তাদের ভয়, পুরাতনের দিকে এত ঝোঁক। যুগের সত্য আপন কাজ করে যে খোলসটা ছেড়ে সরে যায় সেই খোলস বা শব নিয়ে এদের

ব্যবসা। কি ধর্ম্মে কি রাজনীতিতে কি বানিজ্যে কি কলা। শিল্পসাহিত্যে এই রকম শবকাঁধে মোহগ্রস্ত শিবের দল এক একটা সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদয় হয়। এই মোহই হলো সমাজ বা জাতিরূপ শিবের পতন, এবং এর ফলেই মৃত্যু বা প্রলয়। যে দেশে তা ঘটে, সে দেশে সত্যের দেবতারা জন্মে বিষ্ণুচক্রে ধর্ম্মের বা শক্তির শব ছিন্ন বিছিন্ন করে আবার নূতন করে দেশ-আত্মাকে জাগায়। আজ সেই দিন এসেছে, সমাজের পচা মড়া, রীতি নীতির দুর্গন্ধ শক্তিদেহ, রাজনীতি বানিজ্যের পুরাণ ধারা, ধর্ম্মের গলিত বিগ্রহ আজ ভাঙতে হবে। শ্মশানবাসী হয়ে এ জাতিকে আবার তপস্যায় নতুন জীবন-উমাকে পেতে হবে।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

মানুষ মরে যখন না যায় স্বর্গে না যায় পাতালে তখন ভূত হয়ে এই: পৃথিবীতে নাকি ঘোরে। তাদের জ্বালায় ঝাওড়া গাছ আর ভরদুপুর বেলা এলো চুলে বউ ঝি থাকবার জো নেই, অমনি ঘাড়ে চাপবে। ঘাড়ে একবার চাপলে বৌ মাথার কাপড় ফেলে কত অনাসৃষ্টি যে বকবে, কি বেহায়া কাণ্ড যে কখন্ বাধবে তার হিসেব কিতেব নেই। ভূতে পাওয়া বৌ ঝি পাড়ায় থাকলে পাড়া সশঙ্ক, বাড়ীর উঠানে লোকের গাঁদি লেগে যায়; কত রোজা ডাকান শর্ষে পড়া মানৎ করার পর যখন ভূত নামে তখন সে একটা গাছ ফেলে দিয়ে চলে যায়, আর বৌও বাঁচে, পাড়াও জুড়োয়।

মানুষ মরে যেমন ভূত হয়, একটা সত্য বা আদর্শ মরেও অনেক সময়ে তেমনি ভূত হতে দেখা গিয়েছে। সে ভূতের নাম শব্দ বা কথা। মানুষ ভূত হলে যেমন গয়ায় পিণ্ডী

দেওয়া অবধি পাড়ার শোয়াস্তি নেই, আদর্শ-মরা শব্দে পেলেও তেমনি মানুষের বা সে জাতের সুখ শান্তি থাকে না। যেমন ধর ত্যাগ ; ত্যাগ জিনিষটা খুব বড়, ত্যাগ করে মানুষ দেবতা হয়। কিন্তু ত্যাগ যদি মারা যায় আর শব্দটা আসর জুড়ে থেকে যায় তা' হ'লে তার কচকচিতে দেশ উদ্বাস্তু হবার যোগাড় হয়। এই রকম অপমৃত্যুর ফলেই ন্যাড়ানেড়ী সন্ন্যাসী বোষ্টম হয়েছে ; তারই ফলে মায়াবাদ জাতিভেদ তিলক গঙ্গা-স্নান গজিয়েছিল, তার ফলেই যত আচার বিচার দলাদলি গুঁতোগুঁতি হাঁড়ি-মার্গ ছুৎ-মার্গ স্ত্রী আচার ও কাষ্ঠ তপস্যার আড়ম্বর।

আবার দেখো মুক্তি। মুক্তি কি যে পদার্থ তার ঠিক নেই, কিন্তু কথাটার দৌরাত্ম্য কি ধর্ম্মে কি কর্ম্মে কি রাজনীতিতে কি সমাজে হুলুস্থুলু ব্যাপার। কত মানুষই না মৌনী হয়ে ঊর্দ্ধবাহু দশায় হাত পা শুকিয়ে ফেলেছে ; কত জাতি রাজা মেরে উজীর রেখেছে, উজীর উজোড় করে পঞ্চায়েত বসিয়েছে, কিন্তু আলেয়ার মত মুক্তি বা স্ব-তন্ত্রতা মানুষের নাগালের বাইরে সরে সরে যাচ্ছে আর দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে—সেই-ই-ই একটা দিগান্তর মাঠের পারে।

ভগবানও মরে বহুকাল হ'লো "ভূত বলে ভূত ?' একেবারে ব্রহ্মদত্যি হয়েছেন। ভগবান যে কি বস্তু তা কেউ

খোঁজে না, কেবল ভগবান বানায় আর তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে। কারু কাছে ভগবানের আকার নেই, কাজেই আকার প্রকারের জিনিষগুলো বেমালুম বাজে ফক্কিকারী ব্যাপার। না মানো একথা, তুমি তা'লে একটা আস্ত পাষণ্ডী। কারু কাছে ভগবানের পুরুষ রূপ আর দু' হাত, কিন্তু চতুর্ভুজা স্ত্রী ভগবানের চেলারা এই দলকে পেলে আর আইনের বালাই না থাকলে একবার মনের সুখে থোড়-কাটা করে কাটে।

যদি মানুষের মত একজন মানুষ এসে একবার বলে "কামিনী ভাল নয় রে, একটু পাশ কাটিয়ে চলিস।" আর রক্ষে নেই! নারীকে মানুষ আগে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে শাস্ত্র-পার ধর্ম্ম-পার রাজ্য-পার পগার-পার করে নরকের দ্বারে বসিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে; তারপর যদি একবার ভাবে কথাটার মানে কি। যদি বল ভগবানের ভজন আপনি হয়, এ যে বড় সহজ ধন; তা' হ'লে ন্যাজ তুলে কেউ দেখবে না, একথাটি কোন্ অবস্থায় বললে সত্য হয় ও শোভা পায়, অমনি সব ছেড়ে খঞ্জনী বাজিয়ে নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মানুষ লেগে গেল অথবা বলে বসলো, "যোগ করবো কি, যোগ তো স্বতস্ফূর্ত্ত!"

এই রকম কত বলবো। এক একজন অবতার এসে

গেছেন, আর তাঁদের গদী বা রাজতক্ত জুড়ে কতকগুলি কথা ও হাব-ভাব রাজত্ব করছে ও মানুষকে ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে বসে আছে। বহির্মুখ মানুষ বাহিরের একটা কিছু একবার পেলে হয়, তা' হলেই সে তাই বগলে নিয়ে দে লম্বা ছুট, আর হাটে বাজারে তাই-ই সত্য বলে পাচার করবেই করবে। তাই আগে ঋষিদের মিটিং বা সভা বসলে তা'তে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করতে বসে একজন ঋষি আর একজনকে কখন জিজ্ঞেস করতেন না, যে, "তুমি কি জান", সর্ব্বদা জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কি দেখেছ।"

সত্য চিরদিন দেখবার জিনিষ। ভারতের সত্য যে দেখেছে কেবল সেই নিখুঁৎ করে নবভারত গড়তে পারে। মানুষের এত দিনকার ইতিহাস ও জীবনের সমস্ত সত্য মন্থন করে জ্ঞানসুধা যে স্থিতধী মানুষ নিজের অন্তর পাত্রে উদ্ধার করেছে সেই জানে কোন্ মুক্তি কোন্ স্বরাজে জগত-তারণ সম্ভব হবে। তাই বলি দেখো দাদারা সব, স্বরাজের সত্য গোলে হরিবোলে হারিয়ে গিয়ে কথাটাই ভূত হয়ে ঘাড়ে না চাপে। তা' হ'লে এ ভূতে-পাওয়া জাতির আর রক্ষা নাই। কারণ এ সত্য ডিঙিয়ে যাবার জোটি আদৌ নেই, যে, সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

মনের মরণ মনের বাঁচন

এই মরা দেশ সব রকমেই মরা, মনে প্রাণে জ্ঞানে বুদ্ধিতে আবার দেহে স্বাস্থ্যে ধনে জনে এমন বিষম মরা বুঝি আর কোন জাতি কখন মরে নাই : ভারত আজ জীবনের মহাশ্মশান, তাই অট্টহাসিভরা নর-খর্পরধরা অশিবার লীলা-ভূমি। কালের এ মহারাত্রি—মরণের এ নিঝুম ঘনঘোর কোন্ মঙ্গল উষার আশায় বুঝি থম্‌কে আছে ? কি অমৃত পেলে এ জাতি আবার বাঁচে ? ভারতের মরণ ত বাহিরের নয়, এ যে তার মনের মরণ, প্রাণের মরণ, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দের মরণ। দেশের আত্মা—দেশের হিমাদ্রিসিন্ধু জোড়া মন মরেছে, তাই বাইরেও সবই মরেছে,—ভিতরে হৃদ্‌কম্পন থেমে গেছে বলেই ত মায়ের দেহ আজ অসাড়। তোমার আমার ও কোটী কোটী ভারতবাসীর মনের মরণই এই দেশের সে সুখসমৃদ্ধ জীবন ও গৌরবের মরণের কারণ হয়েছে। যে দিন কোন অমোঘ স্পর্শে ও কোন ধ্রুব আদর্শ পেয়ে

আমরা এই মরা মনে আবার বাঁচবো, সেই দিন বাহিরটাও বেঁচে উঠবে। সেই দিন এত যুগের হারাণ ধনসম্পদ রাজপাট সমস্তই জীবন্ত মানুষের জীবনে আবার ফিরবে।

গান্ধী মুনি ও নরদেবতা অরবিন্দ পণ করে তপস্যায় বসেছে। এই সাত যুগের বিষম মরা দেশকে তার হারাণ মনটি তারা ফিরে দেবে। তাদের দু'জনার ধারা আলাদা,তপস্যা দু'রকম। তোমরা গান্ধীজীর কথায় তাঁত কর, চরকা কর, হিন্দি পড়, পঞ্চায়েত গড়; কিন্তু বাঁচবার—হারাণ জীবন ফিরে পাবার সাধন করো না। দেশের মানুষের মনই যদি মরা হয়—মনের গোলামীতে সংস্কারের বাঁধনে তারা যদি চার পায়েই হাঁটে, তা' হ'লে চরকা তাঁত কার হাতে দেবে? জীবনের পরশকাটী না ছুঁইয়ে এ ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগাবে কি করে? গান্ধী মুনি যে বলেন, "তোমরা মনেই গোলাম,মন মুক্ত তবে জগৎ মুক্ত", ঐ মন্ত্র যে লক্ষ কোটী তাঁতের সমান।

অরবিন্দেরও এই হারাণ মন ফিরে দেবার ধারা বড় অভিনব, বড় অনুপম। তুমি আমি এমনি হাজার মানুষ যদি অন্তরে বাঁচি, কোনও অমৃত সিঁচে আপন মরা মন জীবন্ত করে তুলি, তখন অন্তরের সে জীবন-হিল্লোল দেশ ভরে বসন্ত স্পর্শের মত জাগবে, বাঁচাটাই তখন সংক্রামক হয়ে পড়বে। এত বড় অসাড় জাতিটার দুই চক্ষু ভিতরে ফিরে যখন তার

দীন হীন অন্তরটাকে একবার দেখবে, তখনই হবে নবীন সৃষ্টির আরম্ভ। কারণ অনন্তদর্শী না হয়েই এ জাত মরেছে। এই কথা যেমন জাতির হিসাবে সত্য, প্রতি মানুষের হিসাবেও তা' বড়ই সত্য। আমরা ততক্ষণই ছোট ও স্বার্থপর থাকি যতক্ষণ আপন 'স্বরূপ'—সেই সত্যকার আপনাকে না দেখি। ঘরের দিকে দশ দিন না চাইলে ঘর আবর্জ্জনায় ভরে যায়, মন্দিরে নিত্য পূজা না হ'লে মন্দির চামচিকার বাথান হয়। আমাদের ঘটে ঘটে আজ চামচিকার বাথান হয়েছে। ঐ যে দেখ না বাপ বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাড়ী নেড়ে বক্তৃতা করচে, দেশের দুঃখে তার চোখে দরদর ধারা! তার ছেলেকে ধরে টান দেও, দেখবে আর সে দেশপ্রেমিক বক্তা নেই, তার জায়গায় রক্ত-চক্ষু স্নেহকাতর বাপ আপত্তি করছে। যে দেশপ্রেমিক ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে হেঁকে ডেকে বলছে, জাগ ওঠ, দেশকে রাখ, মানুষ হও, তার ঘরের অন্ধকার কোণে দেখগে—তার স্ত্রী বোন মা মাসি পিসী গণ্ডমুর্খ দশায় দেশাত্মবোধ হারিয়ে ভাতের হাঁড়ি ঠেলছে। ঘরের কর্ত্তাকে যদি বল, "নারীকে পূর্ণ জীবন দাও, মুক্ত কর, মুক্তির আস্বাদ পেয়ে সে মানুষের আনন্দে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে দেশ-প্রতিমার রূপ নিক", তখনি পতিব্রতার সেবাধর্ম্মের লেক্‌চার দিয়ে হিন্দুবীর তোমার

মুখবন্ধ করবেন। যারা—আমরা ইংরাজকে এমন করে ভারতের ঘাড়ে চাপার জন্য গাল দিচ্ছি,—সেই আমাদের তলায় দেখ, আমরা কোন্ বাহনের ওপর সওয়ার? দেখবে আমাদের তলায় লক্ষ লক্ষ কন্থা-পরা দীন হীন মানুষ আমাদের চাপানো শূদ্রত্বের চাপে চিঁ চিঁ করছে। মুক্তির নামে আমরা যত লাফাচ্ছি, তাদের প্রাণান্ত ঘটিয়ে তাদের ঘাড়ের ওপরই লাফাচ্ছি।

তাই বলি, ভাই, মন জাগাও। এই শবরূপা মাকে কাঁধে নিয়ে বৈরাগী বিশ্বম্ভর হয়ে কত কাল ত্রিলোক ঘুরবে। ঐ পুরাণ পচা সামাজিক আচার ব্যবস্থারূপ মড়াকে জ্ঞানের বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড করে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে দাও। মা আমার নবরূপ ধরে নতুন শক্তি হয়ে ফিরে আসবে, মায়ের পুরাণ শরীরও তা' হ'লে ব্যর্থ যাবে না; নতুন দেশে জীবন্ত মাটিতে সে জীবনের স্বর্গে যেখানে যেখানে মায়ের যে অঙ্গ পড়বে সেখানে সেখানে পূর্ণ তীর্থ রচে' উঠবে। নতুনের বুকে পুরাতনই সার্থক জীবনে জীবন্ত হবে। এ দেশকে জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে অন্তর হতে বাঁচাও, বাহিরের মায়ায় ছুটে বেড়িও না। কর্ম্মের ডাক কা'কে দেবে? মন-মরা জ্ঞান-মরা শক্তি-মরা কি কারু ডাক কখনও শোনে?

তৃতীয় পর্ব্ব।

জীবনের ভীত।

বাঁচার মত বাঁচা

বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই কথাই বলছি,—এ জাতিকে নিজেকে খুঁজে পেতে হবে, সজ্ঞান হতে হবে, আপন শক্তি সামর্থ্যের হিসাব কিতাব বুঝে নিতে হবে। সজ্ঞান জাগা জাত অনর্গল সৃষ্টি করতে পারে, জীবনের শাখায় শাখায় নিত্যই নতুন করে ফুল ফোটাতে পারে, কারণ সে আপন স্বরূপ জানে, নিজের আনন্দের মূল চেনে, আর সে জানে যেখান থেকে শক্তি আসে, জ্ঞান আসে, জাতির অন্তর দেবতা যে গোপন স্বর্গ থেকে বিগ্রহ ধরে ধরে তার জীবন ভরে রূপ নেয়। তাই জীবন্ত জাতি—কোন জাগা, স্বতন্ত্র জাতি যা' গড়ে যা করে তাই অভিনব, তা'তেই তাদের জাতের ধারা ও প্রতিভার ছাপ জল জল করে। নিজের গৌরবে আপন শক্তির মহিমায় যে জাত অটল ঠাঁই পেয়েছে সে জাত কখনও পরের নকল করে না; আপনার কুবের ভাণ্ডার উজাড় করে

দিতেই সে ব্যস্ত, অন্তরের অফুরন্ত মধু-ঋতুর সবুজ জোয়ারেই সে পাগল, নকল সে করবে কিসের দৈন্যে ?

জাতির মরণ আসে বিজেতার হাতে নয়, সে রাজনীতিক মরণ অনেক পরের লক্ষণ—অবনতির একেবারে শেষ পৈঠা। জাতির মরণ ঘটে তখনই, তার অবনতির বিষ-বীজ রোপণ করা হয় তখনই, যখন সে নিজেকে হারায়, আপন অখণ্ডের ঘরের চাবি তার যখন খোয়া যায়। আপনহারা জাত ক্রমে মন হারায়, প্রাণের শক্তি তার ক্ষীণ হয়ে আসে, শেষে দেহও যায়-যায় হয়ে ওঠে। এক একটি গোটা গোটা মানুষের বিষয়েও যা সত্য, জাতির হিসাবেও তাই সত্য। ভগবান্ অনন্ত শক্তির আধার, এক একটি মানুষ রূপ ধরে এসেছে সেই অনন্তের এক একটি দল খুলে দেখাতে। সেইটুকু দেখাতে না পারলে —আপন জীবন-সত্যকে প্রকাশ করতে, জীবন ফলিয়ে নিতে না পারলে সমস্ত মানুষটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে তা' পারে তাকেই আমরা কবি বলি, বীর বলি, ঋষি বলি, মহাপুরুষ বা দেবতা বলি; কে কতটা শক্তির কত বড় সূর্য্য আপন উদয়াচলে তুলেছে তার হিসাব নিয়ে আমরা মানুষের বড় বড় নাম দিই ও পূজা করি। আর যে হাজার হাজার মানুষ ভবের হাটে এসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরে ফিরে চলে যায়, এ বাজারের ভরা হাটে তাদের পসরা নামাতে পারে না, তারাই

আপনার আপনাকে খুঁজে পায় নি ; তারাই স্ব-তন্ত্র নয়, তারা পর-তন্ত্র, তাদের নিজের কিছু নেই বলেই তারা পরের দেখাদেখি চলে, বলে, করে ও ক্রমে ব্যর্থ হয়ে ফুরিয়ে যায়।

জাতিও তাই। জাতিরও "স্ব" আছে, আত্মা বা soul আছে, শক্তির অক্ষয় গোপন কুবের-পুরী আছে। সেখান থেকে যখন সে গড়ে তখন সবই নিছক আপন ভঙ্গীতেই গড়ে, জগতে আর কেথাও যা নাই তাই নিজের বুকের মাঝ থেকে বার করে দেখায়। য়ুরোপে ফরাসী জাতির কোন্ অমর প্রাণ তার ভিক্টর হিউগোতে, তার জোয়ান অব আর্কেতে তার রুসো ভলটেয়ার বা আনাতোল ফ্রান্সেতে মুর্ত্ত্য হয় বলতে পার? আবার জার্ম্মাণীতে দেখো তাদের জীবন-সত্য আর এক রকম। তারা যা' করে বা দেয় তা' আর কোন জাতি দিতে পারে না, অন্ততঃ তেমন করে দিতে জানে না। রুসের টলষ্টয়, টুর্গেনেভ, লেনিন ইংলণ্ডে গজায় না ; রুষের জীবনবেদ আলাদা। এই সব জাতি যখন যখন বেঁচে ওঠে, হাতড়ে হাতড়ে আপনাকে পায়, তখন তখনই নতুন করে বুক চিরে তার জীবন-মনি বাহির করে, তখন তখনই তাদের কবি গায়, শিল্পী গড়ে, যোদ্ধা রাজপাট নিষ্কণ্টক করে, ঋষি তার শক্তির নতুন নতুন উৎস খুঁজতে গিয়ে ধ্যানের জগতের দুয়ার খোলে।

মানুষ গড়া

ভারতকে সত্যিকার বাঁচা বাঁচতে গেলে, যুগযুগের জন্য অমোঘ অক্ষয় রচনা গড়তে গেলে আপনাকে চিনতে হবে। দশ গুরুর সাধনায় শিখ বেঁচে ছিল দুদিনের তরে, রামদাসের তপস্যায় মহারাষ্ট্র উঠেছিল ক্ষণিক আতসবাজীর মত, তারা বেঁচে উঠে জগতকে খুব বড় কিছু দিতে পারেনি, বেশী দিন টিকে থাকতে তাদের শক্তিতে কুলোয় নি। তার কারণ নিছক রাজনীতিক বাঁচা খুব বড় বাঁচা হয়ে দাঁড়ায় না, যদি তার মূলে জাতির অমর আত্মা না জাগে, যদি সে জাতি অনন্তকে পেয়ে সিসৃক্ষু না হয়। সে সব যুগে মুসলমানের উপর রাগের বাঁচা বাঁচতে গিয়ে ভারতের পরমার্থ জাগরণ ও দুদিনে ফুরিয়ে গেছে, তাই এবার মূল থেকে নাড়া দিতে হবে। ভারতের ভগবান না এলে ভারতের লক্ষ্মী অচলা হয়ে আসবে না, তাই বলি তোমরা শুধু মানুষ হবে বলে জেগো না, ভাগবত হও। নিজের স্বর্গ খুঁজে পেলে, সেখানকার গঙ্গা নেমে এলে মর্ত্ত্য তোমার ধনে ধান্যে আপনিই ভরে যাবে।
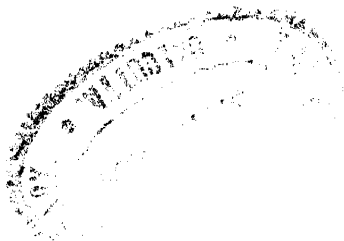
মানুষের আত্মঘাত

মানুষকে তার সহজ জন্মগত কোন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম অধিকার থেকেও নিঃস্ব করতে নেই। সামান্য পয়সার কাঙাল করলেও সেই ক্ষুদ্রতায়ই, দেখনা মানুষ ভিতর থেকে কুঁচকে দীন হয়ে যায়। প্রকাণ্ড গুণী জ্ঞানী শক্তিশালী লোকের মর্য্যাদা ও আত্মসম্ভ্রম হরণ করলে, তার নিজেরই চোখে তাকে লজ্জিত ও ছোট করলে সেই লজ্জা ও হীনতার ক্লেদে অতি অল্প দিনেই তার মহত্ত্ব ঘোলা হয়ে আসে, ক্রমশঃ সে মানুষ যেন সকল গুণে নিঃস্ব হয়ে মাথা হেঁট করে চলতে শেখে, কোথা থেকে যত দীনের উপযোগী দীনতা ও কপটতা এসে তার দেহ মন আশ্রয় করে। জাতে-ঠেলা মানুষের জাতে ওঠবার ক্যাঙলামো বড় কঠিন ক্যাঙলামো ; তার জন্যে সে না পারে এমন অপকর্ম্ম, এমন আত্মঘাত নেই। জাত-ক্ষোয়ান মানুষের মন এমন দীন হয়ে যায় তার কারণ সবার চোখে মুখে ব্যবহারে

চলনে "ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে" ভাব দেখে দুঃখে সঙ্কোচে তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিষিয়ে থাকে ; সে বিষে যে কেবল তারই অন্তর বাহির পচে ওঠে তা' নয়, তার অঙ্গনিঃসৃত একটা দূষিত অভিশাপের বাতাসে গরীবের জাত মারবার কর্ত্তা ঐ মোড়লদেরও জীবনের ভিতে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে শূলে বা ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলা বরঞ্চ ভাল, কিন্তু তাকে অপাঙক্তেয় করে জাতে ঠেলা নরঘাতের চেয়েও ঢের জঘন্যতর পাপ।

অভিমান ও রাগ দীনের ও পদদলিতের অস্ত্র। তুমি যেমন তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে তাকে ছোট কর, সেও তোমা থেকে বিমুখ হয়ে জোট বেঁধে বেঁধে সবল হয়, তার পর চাই কি একদিন তোমায় পিষে ফেলতে পারে। মানুষ হচ্ছে ভাগবত অংশ, তার মরণ নেই ; সে পড়ে বটে কিন্তু সে পতনেরও একটা সীমা আছে। তুমি যাকে পায়ে দলতে আরম্ভ কর, পায়ে দলতে দলতে তার মধ্যে সুপ্ত ভাগবত শক্তি বেঁচে ওঠে, শেষে পাষাণ-স্তম্ভেও নৃসিংহরূপী ভগবান জাগে।

সদা জাগ্রত ভগবানের সৃষ্টিতে তাঁর আপন সত্ত্বায় আপন শক্তির আনন্দে গড়া সকল মানুষই সমান, আমরা জাত সৃষ্টি করে করে এই ভগবানের অবমাননা করি, অত বড় শক্তির শক্তি-হরণ করবার জন্য যেন দশস্কন্ধ রাবণ রূপ

ধরি। ভগবানের অংশ স্বরূপ—তাঁর আত্মময় অঙ্গবিলাসী এই সব মানুষকে এই রকম নিশাচর-বৃত্ত হয়ে আমরা যতই হীন করি, তত সেই জগদ্ব্যাপী বিশ্বশক্তি আমাদের অদৃষ্টে খড়্গময়ী রক্তাম্বরা শ্মশানকালী হয়ে দাঁড়ায়। এই মনে রেখ, যে, ভগবানের শক্তি যত বড় তত নীরব, যত অমোঘ তত চক্ষুর অগোচর—জ্ঞানের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত বলে ততই তার খেলা তার প্রতি-প্রহার ও প্রতি-ক্রিয়া সহজে বুঝবার নয়। তাই না আমরা অবাধে নির্ভয়ে অহংকার ও মান মর্য্যাদার গণ্ডী গড়ে গড়ে মানুষকে নিয়ে কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মহাসুখে মেতে থাকি; বুঝি নে যে পরের হাত পা ভেবে যে গেরো যে বাঁধন প্রতিনিয়ত দিচ্ছি,তা আমারি অঙ্গের বল হরণ করছে, আমারি সর্ব্বনাশের বিষবীজ কালের ক্ষেতে রুয়ে রাখছে। একদিন পায়ের তলার এই সব দলিত কীট লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল হয়ে আকাশ আঁধার করে আসবে, আমার এত সাধের সোণার ক্ষেত মুড়িয়ে খেয়ে যাবে, তারপর সপরিবারে বসে বসে তিল তিল করে মরে আমাকেই এই যুগ-যুগান্তরের অবাধ পাপের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যে আগে মরেছে সেই সে মরণের মাঝে অমৃত পেয়ে আগে বাঁচবে; তার পর আমার কি হবে?

কি রাজনীতিতে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি শৌর্য্যে

বীর্য্যে,কি ব্যবসায়ে যাতেই মানুষকে অপাঙ্ক্তেয় করেছ, দেখগে তাতেই মানুষ এমন বিষম মরা মরেছে যে দেখলে অবাক্ হতে হয়। দেখগে সেই মরণই বিষ হয়ে জীবন হরণ করতে করতে শেষে তোমারি চারি দিকে শ্মশান রচনা করে তুলছে, তোমার জীবন সৌধের ভিত ক্রমশঃ ক্ষয় করে আনছে। য়ুরোপের জাতি সমূহ রাজনীতিতে পরদেশ পররাজ্য পরসভ্যতা হরণ করে যে পাপে কলঙ্কিত হয়েছে, যে ভাবে জগতের দিব্যশ্রী নষ্ট করছে, আমরা হিন্দুরা ধর্ম্মে ও সমাজে আমাদেরই আত্মজনের মান মর্য্যাদা হরণ করে ঠিক তাই-ই করেছি; অধিকন্তু ওরা পরকে মেরেছে, আমরা, আপন গলায় ছুরি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছি।

তবেই দেখ কতদূরের বন্ধন অবধি ঘোচানোর নাম স্বরাজ বা মুক্তি। ভগবৎকৃপা না হলে মানুষ এতদূর তলিয়ে বোঝে না, শুধু ভাবে উপরের এই কয়টা গেরো খুলে দিলেই বুঝি মানুষ মুক্ত ও সুখী হয়। বিশেষতঃ পরের দেওয়া গেরো শীঘ্রই চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের হাতে রচা কারাগারের পাঁচিল ও ঘর বলে মনে হয়, মন তাকে বন্ধন বলে সহজে স্বীকার করতে চায় না।

আমাদের জীবনের ভিত

আজ ভারতে যে আদর্শ খাড়া করা হচ্ছে, তার ভিত হ'ল নীতি। সত্য কথা বলা, মিথ্যাকে ত্যাগ করা, মানুষে মানুষে ভেদ ঘোচান, প্রেমের আদান প্রদান, জীবে দয়া, পাপকে ঘৃণা এই সব নীতির সত্যে মানুষকে ভাল করা এ আন্দোলনের মূল মন্ত্র। এটি পশ্চিমের জীবনের লক্ষণ; পাপ পুণ্যের নিরিখ কষে চরিত্র গড়া খৃষ্ট ধর্ম্মের মূল কথা। ভারতের কথা নীতি নয়, পরমার্থ সত্য; উপরের সত্য পেলে মানুষ আপনি বৃহৎ হয়, মহৎ হয়, শিব হয়, এই হল প্রাচ্যের বিশেষতঃ, ভারতের জীবনের ভিত। নীতি এখানে মুখ্য নয়, গৌণ; মানুষ আপন সত্য খুঁজে পেলে—সেই অমৃতে আবার নতুন জন্ম লাভ করলে পর সত্যকার নীতি আপনি পাষাণ ফেটে গঙ্গার মত নামে।

পশ্চিমের এই নৈতিক আদর্শের মধ্যে অধিকার ভেদ নেই, এক ছাঁচে একই প্রস্থ পুণ্যের বিধি নিষেধের শক্ত শাসনে ও

বাঁধনে সমস্ত মানুষকে বেঁধে গড়া, তাই দিয়ে ভয়ে ভক্তিতে শাসনে বাঁধনে যা' আদর্শ সমাজ বা জগত হয় তাই এ সব আন্দোলনের মুল কথা। ভারত কিন্তু অধিকার ভেদ মানে, হিন্দুর কথা তো তাই বটেই এমন কি বুদ্ধদেবও সন্ন্যাসী ও গৃহীর পৃথক নিয়ম মেনেছিলেন। হিন্দু মানুষের সমস্ত জীবনটি তার নিখুঁৎ বৈচিত্র নিয়ে দেখে, সে জানে এ জীবনের অনেক ধারা, এ জীবন সত্যের অনেক ভঙ্গী, এর বহু বিচিত্র বিকাশ সম্ভব। এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তিতেও সেই একই মহাসত্য নতুন ভঙ্গী নিয়ে নতুন ঈষণায় ফুটতে চায়। অধিকার ভেদ মানেই স্তর-বিন্যাস, ভেদকে সত্যের মাঝে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়ে তোলা, তার প্রতি তরঙ্গটি স্বীকার করা।

আমাদের দেশে নাকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। অথচ আমাদের দেশে যখনই কোন নতুন পন্থা বেরিয়েছে, অমনি সমাজে তার স্থান হয়েছে, কেউ কাউকে চেপে মারে নি। য়ুরোপ নাকি Individual libertyর দেশ! অথচ তলিয়ে দেখ, ব্যক্তির সত্যিকার মুক্তি য়ুরোপেও নেই। য়ুরোপে সর্ব্বত্র সবার জন্য এক রাজবিধি, এক সমাজবিধি, এক ছাঁচ, একই কষ্টিপাথর। তাই তো ওসব দেশে এনার্কিজম্ মাথা তুলেছে, তারা বলে, "আমরা বিদ্রোহী, কারণ তোমার ব্যবস্থা বিধি নিষেধ ও জীবন আয়তনের

চাপে আমি নড়তে চড়তে পাই না, I am repressed under your system."

য়ুরোপে ব্যক্তির স্বাধীনতার আদর্শ মাত্রই আছে, তা আজও খাঁটি হয়ে জন্মাতে পায় নি। সে দেশে সবাই মনে মনেই তা' স্বীকার করে কিন্তু কেউ তা জীবনে আনতে গেলেই গোল বেধে যায়। প্রাণের ও দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা বাসনা কামনার দাস যে মানুষ তাকে একেবারে মুক্ত দেওয়া সত্যসত্যই চলে না, তা'তে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অনিবার্য্য। আমি যদি আমার বাসনা কামনার যথেচ্ছ চরিতার্থতার জন্য চেষ্টা করি, তা' হলেই অন্যের স্বার্থে ঘা লাগে। কতকটা সীমার মধ্যে গণ্ডী কেটে সবার স্বার্থের সঙ্গে আপোস করে আমায় তা ভোগ করতে হয়।

হিন্দুরা জীবনের প্রেরণাগুলিকে (life forces) জানতেন, তাই তাদের ভেদ স্বীকার করে সেগুলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ কেটে দেবার কতকটা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রাচ্যের আদর্শে আমরা ক্রমাগতই উপর হতে— মানবের সত্তার বৈকুণ্ঠ হতে সত্য সব গ্রহণ করেছি মনের ছাঁচে, আর নীচের জীবনে তা' বিধি ব্যবস্থায় বাঁধতে গেছি, ফলে মানব-জগতের ফাঁকা বিধি বিধিই থেকে গেছে, জীবন আপন মনে নদীর বেগে ভিন্ন পথে বয়েছে। আমাদের

বিবাহের আদর্শ এক, সত্যকার বিবাহ আর; আমাদের গুণ কর্ম্মের বিভাগ এক, আর জন্মগত জাতিভেদ আর; আমাদের নারীর নিষ্ঠা সতীত্ব মহত্ব এক, তার নামে সামাজিক নিপীড়ন আর। আদর্শে আর জীবনে কোনখানেই সঙ্গতি নেই, সামঞ্জস্য নেই। না থাকারই কথা, কারণ সত্য মতিমানস ভূমির বস্তু আর জীবন তরল প্রাণময়। সত্যের মানস ছায়াটুকু নিয়ে তার চাপে জীবনকে কঠিন করে rigid বিধিগত করে রূপ দিতে গেলেই তাই হয়। কারণ জীবন তরল মুক্ত গতিময় শক্তি-প্রস্রবণ, তাকে দুই তটের মাঝে বাঁধতে হবে, আবার এঁকতে বেঁকতেও খুব অবসর দিতে হবে। আলগা সহজ ও নরম করে তার আয়তন গড়তে হবে, যাতে নিজের বেগে ও বিচিত্রতায় তা ক্রমাগতঃ ভেঙে ভেঙে বদলাতে পারে, জীবন-সত্যের truth of lifeএর সকল ঈষণা সফল সার্থক করতে পারে।

তাই এ কথা যথার্থ, যে, আমাদের সভ্যতা ও জীবনের ভিত হচ্ছে নিয়ম কানুন নয়, কল কব্জা নয়, শক্ত করে গড়া প্রতিষ্ঠান নয়, আমাদের জীবনের ও সভ্যতার ভিত হচ্ছে সত্য। সত্যই মূল, তা থেকে আপনি সহজ লীলায় বহু বিধি, বহু যন্ত্র, বহু প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দে গজাবে, সত্যকে মুখ্য কাণ্ড রেখে, আপনারা তার শাখা পত্র হয়ে।

সত্যকার ডিমোক্রাসী

তোমরা মুক্তির কথা বল—স্বাধীনতা চাও? তোমরা মুক্তি কি তা' জান কি? তোমরা চাও মুক্তির নামে শেকল গড়তে, দেশ স্বাধীন করবার নামে পরকে শাসন করতে, দেশহিতের অজুহাতে মোড়লী ভোগ করতে। জেলখানায় মানুষকে পায়ে বেড়ি হাতে হাত-কড়ি দিয়ে ভাল করে—মানুষ তার নাম দেয় ন্যায় বিচার ও reformation। তোমরা ত হাজার হ'লেও সেই মানুষ? তোমরাই ত পরলোকের মুক্তির নামে পুণ্যের নামে একদিন টিকি তিলক চৌষট্টি নরক গড়েছিলে। আজও যার ফলে অন্ত্যজ, পারিয়া, হাড়ি, মুচীতে দেশ ভরে আছে, মাদ্রাজে তাই পুণ্যাত্মা বামুনকে পারিয়া ছুঁতে গেলে নরকে যাবার ভয়ে পারিয়াকে বামুন মারতে আসে।

মুক্তির নামে কত শেকল, কত হাত-কড়িই না মানুষ আজ অবধি গড়েছে,—রাজা, উজির, জমিদার, প্রভু,

ধনপতি, বেণে, পুলিশ, জাঁদরেল, পল্টন, পুরুত কত আর নাম করব! এই সব হচ্ছে নানারূপে মানুষ-বাঁধা কল, গরু পিটিয়ে গাধা বানাবার ছাঁদন-দড়ি গোদা-বেড়ি। জিজ্ঞেস কর দেখি,—"ছাঁদন-দড়ি গোদাবেড়ী, তুমি কার?" উত্তর পাবে, "যখন যার হাতে থাকি তখন তার।"

ওগো মানুষ! তোমরা নীতির, ধর্ম্মের, জাতকুলের, রাজভক্তির, ন্যায়ের, রাজনীতির কত কিসের দোকান খুলেছ! ঐ পচা ধসা আত্মাভিমান ও পরস্বাপহরণের রঙচঙে খেলনা —কিংখাপ শাটিন মোতি জহরতের বেসাতি তোমাদের আর চলবে না। তোমাদের পোকে কাটা পচা পুঁথির জ্ঞানে মানুষকে নষ্ট করবার, উচ্ছন্নে ও অধঃপাতে দেবার দিন ফুরিয়েছে। ওগো পাপ পুণ্য দেশহিত জনহিতের মুখসপরা পোষাকী দোকানদার! তোমরা যত শীগ্‌গির পার পাত-তাড়ি গুটোও, মানে মানে গণেশ উল্টে যঃ পলায়তি স জীবতির রাস্তা ধর।

মানুষ জাগছে। এবার মানুষের কূলপ্লাবী জোয়ারে তোমরা ভেসে যাবে। যারা জীবনের পথ বুঝে ফেলেছে— সেই সব সব-জান্তা একলষেঁড়ে বুদ্ধিজীবীর কথায় জাগা-মানুষ পথ চলবে না। কারণ জীবনের সত্য পথের সন্ধান যে জানে, সেই মন-গুরু ঘটে ঘটে অন্তরে অন্তরে জাগছে।

এবার মাটির রাজত্ব। যারা সোঁদা গন্ধে ভরা, শ্যাম দুর্ব্বায় ঘেরা সরস স্নিগ্ধ মাটিকে বুক দিয়ে ভালবাসে, মাটিই যাদের জীবন, তারাই জনশক্তি—তারাই প্রজা। মাটি ডাকে—মানুষ সাড়া দেয়; তাদের হাতের চষা ভুঁয়ে লাঙ্গলের ফলায় জনকদুহিতা সীতা জন্মায়।

এই মাটীর প্রেমের নাম মুক্তি। ঘটে ঘটে ও বাঁধন-হারা জীবনে মন-গুরুর ডাকের নাম মুক্তি। তোমরা ইমারতি সভ্যতায় নগরের পচা গলিতে ইটের সাজান পাঁজায় বসে স্বাধীনতার বইয়ে পড়া বুলি কপচাচ্ছ! তোমরা মুক্তি চেন না—চেন মোড়লী, মতের গোঁড়ামী, আর হাত তালির ঝড়। তোমরা বিলিতী রিপাবলিকের মৌতোগোরী মাতাল; তাই সমাজ গড়ে, রাজ্য গড়ে, শাসন যন্ত্র গড়ে মানুষকে সেই ঘানীর বলদ করতে চাও। সরে পড়, দাদা; কাল বৈশাখী ঝড়ের মাতনে বিজলীর ঝলকে আগুণ ছুটিয়ে আসবার আগে প্রাণ নিয়ে সরে পড়। তোমার মতের লাঠি আর চলবে না, তোমার বিদেশী ভাবের নাচন কোঁদন দু'দণ্ডের নেড়ানেড়ির কীর্ত্তনে লোক আর ভিড়বে না। তোমার গিণ্টির গয়না পরে পথের আধ আঁধার আধ আলোয় মানুষ ভুলানর দিন গেছে।

যার আলো দীন দুঃখী থেকে রাজার ঘরে বিনি পয়সায়

খায়, যার জল বাতাস পশুপাখীও অবাধে প্রাণ ভরে খায়, যার জ্ঞান বাকল পরা ঋষির কপালে ত্রিনেত্রের সৃষ্টি করে, তার মুক্তি বিলাতে মানুষ এসেছে। জয়-জগন্নাথ! এবার তোমার সিংহাসনে তুমি বস, মায়ার পারে যার বৈকুণ্ঠ সেই ঠাকুর মায়া ভরে অবতীর্ণ হও। মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়ালে, আত্ম স্বরূপ চিনলে, পায়ের শেকল খুললে সেই ত তোমার বিগ্রহ, তোমার অবতার। জয় জগজ্জীবন! এবার মন্ত্র তন্ত্র শাস্ত্র সমাজ চুলোয় যাক! মুক্তির বৈকুণ্ঠ তুমি এস।

"স্বরাজ"

আমার বলবার সব চেয়ে বড় কথা "স্বরাজ"। মানুষের পূর্ণ মুক্তিই আমাদের কাম্য ধন; আমরা তাই বলি, তাই বোঝাই, আর জীবনে তাই গড়বার সাধনে নেমেছি। এই "স্বরাজ" বুঝতে গেলে প্রথমে সব রকম স্বরাজের বিলিতী নক্সা ও যন্ত্র পাতি ভুলতে হবে, ভারতের মনটি আগে ফিরে পেতে হবে। শুধু রাজনীতিক হিসাবে স্বাধীন হ'লেও যে ভারত এমনিই মরা থেকে যেতে পারে সেইটে সবার আগে বোঝা দরকার। য়ুরোপে একদিন গ্রীস খুব বড় ছিল, একদিন সে এমন রাজবিধি গণতন্ত্র গড়েছে, এমন চিত্র এঁকেছে ও ভাস্করের হাতে এমন অনুপম কারু মূর্ত্তি গড়ে দেখিয়েছে, যে, সেই সৃজনী জ্ঞান ও আনন্দে গ্রীক সভ্যতাই য়ুরোপকে বহুকাল উজ্জ্বল করে রেখেছিল। আজ গ্রীস রাজনীতিক জীবনে স্বাধীন বটে কিন্তু সে অমরবীর্য্য দেবপ্রতিভা জাতি আর নাই, গ্রীস আজ সর্ব্বাংশে মরা।

আমাদের দেশও মরে গেছে, তার অন্তরের প্রেরণা শক্তি ও আনন্দ সব মরে গেছে। একদিন তো সবই ছিল কিন্তু তিল তিল করে এ জাতি আবার এমনতর মরা মরল কেন? একদিন লক্ষ কোটী হাতে তার অসি থাকতেও মোগল পাঠান ইংরাজ এসে বার বার মায়ের পায়ে শিকল পরাল কেন?

তার কারণ আমাদের প্রাণ-শক্তি ফুরিয়ে এসেছিল, জীবনের উৎস-মুখ কোনখানে পাথর চাপা পড়েছিল, তাই না আমাদের আজ এই দশা।

ভারতকে তুলতে হলে দেহে তার প্রাণ ফিরে দিতে হবে। সে প্রাণ তোমার আমার—দেশ-জননীর এই শত শত সন্তানের মনের সম্পুটে লুকান আছে। আমরা যদি প্রাণ পাই, সঙ্গে সঙ্গে দেশও প্রাণ পাবে, এই ত্রিশকোটী মানুষ ছাড়া তো দেশ বলে আর কিছু নাই। এই ত্রিশকোটী নর-নারায়ণের পুণ্যধূলি তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও বিভূতিই তো ভারতকে এমন তীর্থ করে রেখেছে। মানুষ দীন হলেই, দেশ দীন হয়, মানুষ আনন্দহারা জ্ঞানহারা শক্তিহারা হলেই মাটির দেশ অহল্যার বুকের পাষাণ হয়ে ত্রিশকোটী বুকে চেপে বসে।

শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতা বড় নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই বড়। যেখানে মানুষ মুক্তি পেয়েছে,—প্রাণের বলে মনের বলে বুদ্ধির বলে আর অন্তরের ভাগবত শক্তিতে যেখানে মানুষ দশহস্তে নতুন কাল্‌চার নতুন সভ্যতা নতুন দেবত্ব ও মহত্ত্ব গড়েছে সেখানে দেশ সত্য সত্য স্বাধীন, সেই মানুষ সূর্য্যবংশী রাজার জাতি। চেয়ে দেখ ব্রিটীশের বিশাল সভ্যতা ও কালচার আছে, তার ইতিহাস জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন, তার রাজপাট বিপণি বাণিজ্য তার শৌর্য্য

বীর্য্য গুণপনা জগতে অতুল। কিন্তু সেই মাতৃকোল ছেড়ে কানাডা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এমন কি আমেরিকায়ও গিয়ে সেই জাতি আজও কোন সভ্যতাই গড়তে পারল না। মার্কিণ জাতি গণতন্ত্রের নতুন সাহিত্য কলা ও কালচার. গড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে সন্তান এখনও ব্রিটীশ কাল-চারের নাড়ীর রসে পুষ্ট, স্বাধীন অঙ্গ পেয়ে নতুন হয়ে এখনও সে সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। দেশমায়ের মাটির কোলের টান ও নাড়ীর ব্যথার এমনি মহিমা!

যে জাগরণে সব অঙ্গে প্রচুর বল পেয়ে জাতি আবার নতুন লাবণী ধরে, নতুন জীবন-বেদ গড়ে, নতুন সভ্যতা রচনা করে, সে জাগা ভারত বোধ হয় শেষ জেগেছিল বৌদ্ধ যুগে ও গুপ্তবংশের সময়ে। তার পর ধর্ম্ম ও রাজনীতি নিয়ে খণ্ড জাগরণ হয়েছে, কিন্তু জাতি-আত্মা সহস্র চক্ষু মেলে এমন করে জাগে নি। আধুনিক কালের শিখ মারাঠা বোধনও ঐ ধর্ম্ম ও রাজনীতি নিয়ে, তাতে এ দেশ **creative** হয়ে সাহিত্য কলা প্রসব করে নি, ভারতের সনাতন জীবনরসের তা' কোন নতুন ভঙ্গি নতুন সাড়া আনে নি। রাজনীতিক মুক্তি জাতি দেহের মুক্তি—জাতি-আত্মার মুক্তি নয়।

মানুষের ঠেলায় গড়া "স্বরাজ", মতের গড়া দলাদলির রাজপাট অনেক হয়েছে; মানুষকে তা'তে শান্তি দেয় নি।

রাজনীতিক মুকুট সিংহাসন পল্টন পুলিশের চাপে য়ুরোপে আজ মানুষ ক্ষেপে উঠেছে, এই আসুরিক তেজ কুচকি কণ্ঠাভরা করে পেয়েও ওরা দিব্য আনন্দ জ্ঞানও শক্তির মানুষ আজও গড়তে পারল না, শান্তির স্বর্গ-রচনা আজও য়ুরোপে হয়েও হলো না। কিন্তু এখনও চেষ্টা করলে হয়। মানুষ যদি তার একটা মাত্র শক্তিকে অতি-মাত্রায় বাড়িয়ে তুলে তাই দিয়ে কিছু গড়তে যায় তা' হ'লে ভগবানের রাজ্য টলে ওঠে, নরভোজী রাবণের স্বর্ণকিরীটিনী লঙ্কা ছাড়া তা' দিয়ে আর কিছু গড়া চলে না। মানুষ একটা শক্তি নয়, মানুষ অনন্তমুখী বহুশক্তির পুঞ্জীভূত সূর্য্য। সেই মানুষ পূর্ণ মানুষ অথবা নরনারায়ণ। সেই শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ সূর্য্যের জাতিই সূর্য্যবংশী আর্য্য।

একপেশো একচোখো কাণা মানুষের অহঙ্কারে এমন "স্বরাজ" গড়া কস্মিনকালে হবে না। আমরা তাই সংকল্প করেছি আমরা দেশমায়ের অন্ততঃ এক হাজার ছেলে মেয়ে সাধনবলে জুড়িয়ে শীতল হব, আর সেই অহংজ্ঞানহীন শান্তির আসনে ভগবান্ তাঁর ষড়ৈশ্বর্য্য নিয়ে নামবেন। ভগবান তোমার আমারই আত্মা, তাঁর জাগরণে মানুষ পূর্ণ; এই রকম এক হাজার পূরো মানুষ সম্ভব হ'লে তারাই জগতকে নতুন করে ভূ-স্বর্গ করে গড়বে। তখন সে সভ্যতার রাজপাটে

মানুষ গড়া

সে ভাগবত-স্বরাজে মানুষ দাসও থাকবে না, প্রভুও থাকবে না, মানুষ অসীম আনন্দে জ্ঞানে ও শক্তিতে অন্তর থেকে মুক্ত হবে। সেই স্বরাজ চাই। তোমাদের এত যে লোভনীয় রাজনীতিক মুক্তি তা'হচ্ছে সেই ময়ূর তক্তের একটি মাত্র হীরা, এমন লক্ষ হীরা চুনি পান্নায় সে দিব্য সিংহাসন ঝলমল করবে। তোমার অহঙ্কার এবার অন্তরের ভগবানকে দিয়ে দাও, তিনি তোমার অহঙ্কারে বিশ্বমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ হোন। যদি অহঙ্কারীই হবে তবে নর-নারায়ণ হয়ে নতুন জগত রচা ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী অহঙ্কার নিয়ে স্বরাজ গড়তে নামো।

চতুর্থ পর্ব।

মনের রূপান্তর।

অহং বাবাজীর আখড়া

কেউ ভাবছে প্রজাতন্ত্র গড়ি, তা' হ'লে বুঝি মানুষ সুখী হবে। কেউ বলছে, "উঁহু! গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসী দরকার, মানুষের জীবনে সুখ স্বচ্ছন্দতা ধন জন সমান করে ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রজা-তন্ত্রের কর্ম্ম নয়।" বলসী মাসী খাঁড়া হাতে জনহিতের রক্ত দিয়ে কপালে তিলক কেটে এসে বলছে, "এই দেখো আমি কত রক্তপাত করেছি, জগতে সুখের ও ন্যায়ের হাট বসাতে। তোমরা শূদ্রের মা খাঁড়াখর্পরধরা আমায় ভজ, বামুন, ক্ষেত্রী ও বৈশ্যের রাজ্য ত এতদিন দেখলে; ও সব শালাই চোর।"

মানুষ যে কি করবে, কি উপায়ে জগতে একছত্রা প্রেমের হাট বসাবে তাই নিয়ে হন্যে হয়ে উঠেছে। প্রেমের নামে কিন্তু কেবল কামড়া কামড়ি মারামারি রক্তারক্তি চলেছে, কারণ যে ভিতের ওপর এই সব নিত্য নতুন আদর্শের গাঁথনি চলছে, তা' সেই মানুষের পুরাণ হিংসা দ্বেষের অহংকারী মন ও প্রাণ। বালীর ওপর যত পাকা করে গাঁথনী কর, সে ইমারত ধসবেই। তোমায় আমায় হাতে

পায়ে দড়ি বেঁধে সুখে রাখবার জন্য খাঁচা—তা লোহারই হোক, রূপারই হোক আর সোণারই হোক,—সে যে খাঁচা। তোমার যদি কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়ে থাকে তা' হ'লে কেমন করে তুতিয়ে পাতিয়ে বোঝালে তুমি কাউকে কামড়াবে না বলতে পার? এও যেন সেই রকম ব্যবস্থা করা।

মানুষ যতক্ষণ বার আনা পশু ততক্ষণ বাইরের সমাজ বাইরের রাজ্যপাট বাইরের পুলিশ পল্টন এমনি সব হাজার রকম বাইরের ছাঁদনদড়ি গোদাবেড়ী দিয়ে মানুষকে বাঁধতেই হবে। মনের ঘর কন্না একটি আস্ত চিঁড়িয়াখানা—এই মনের চিঁড়িয়াখানায় বাঁদরের খাঁচায় বাঁদর আছে, সিংহের খাঁচায় নরমাংসভোজী সিংহ আছে, সাপের খাঁচায় কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপ আছে, আবার শান্ত শিষ্ট ঘুঘু আছে গরু আছে, মানুষ আছে, একটু ওপরের কোঠায় অপ্সর কিন্নরও আছে। এতগুলি যেখানে প্রভু সেখানে তুমি কার মন রাখবে, কার বাঁধা বুলি কপ্‌চাবে, কার মুখের আহার জোগাবে?

তাই বলছি ভিত না বদলালে ইমারৎ দাঁড়াবে না। মানুষ মন বুদ্ধির ঘর করে অনেক দিন দেখেছে, দানবে ব্যাপার, পাশব কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই হ'লো না। তাই এইটে এখন পাকা করে বুঝতে হবে যে মানুষ তার সভ্যতা নিয়ে

দেউলে হয়েছে। এখন আগে চাই নন্-কো-অপারেশন নিজের সঙ্গে, আগে বুঝতে হবে যে উপরের দিব্য জগতের দুয়ার রুদ্ধ রেখে শুধু মনের সম্পদ নিয়ে এর বেশী আর কিছু হ'বে না। যতক্ষণ মনে হ'চ্ছে বুঝি ঐ রকম করলে হয়, ততক্ষণ মানুষ নিজেকে না বদলে পুরোণ ভিতের ওপরই সমাজ রাজ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম গড়তে যাবে। যতক্ষণ দুঃখের মুল খুঁজছি বাইরে, ততক্ষণ অন্তরটা কালোই থেকে যাচ্ছে; ততক্ষণ বোঝা যাচ্ছে না, যে, এই উল্টো সংসার-বটের মুল যে উপরে, ডাল পালাই নীচে—এ বৃক্ষ যে উর্দ্ধমূল অধঃশাখ।

তাই বলছি এবার মানুষের সভ্যতার ভিত বদলে দিতে হবে। কারণ মানুষ দেউলে মেরে ফুরিয়ে গেছে, এখন দেবতার দিন এসেছে। এই শুধু মনের জোরে বল-বান চোদ্দ পোয়া মানুষে আর কুলোচ্ছে না, মানুষের বিরাট আমি এত টুকু আধারে ধরছে না। মনুর কাছে মাছ এসে আশ্রয় চেয়েছিল, মনু তাকে কমণ্ডলুতে রাখতে রাখতে সেবেড়ে গেল; চৌবাচ্চায় ছাড়তে ছাড়তে চৌবাচ্চা ভরে গেল, পুষ্করিণী উপচে উঠল, শেষে সাগর গ্রাস করল। মানুষ যে সেই মৎস্য অবতার মহাতত্ত্ব নরকলেবর ধরেছে। তাকে মনের গড়া সোণার খাঁচায় কত দিন ধরে রাখবে?

যারা বলে মন বুদ্ধির মানুষ চিরদিন এমনি থাকবে,

তারা মানুষ চেনে না। তোমার কোলের খোকা যদি চির-দিন অমনি এক দেড় হাত পরিমাণটি থাকে তা' কি শোভন হয়? মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা সীমার গণ্ডী পেরিয়ে কোন্ অসীমে চলেছে, সেই দিকে চাও। সাড়ে তিন হাত দেহের দেহী যে আসলে সার্দ্ধ-তিন-লোকব্যাপী, যেখান থেকে সুখের ফোয়ারাও আনন্দের উৎস বইছে, সেই তোমার আমার উর্দ্ধমূল উৎস যে বুদ্ধির পরপারে।

তাই যুগে যুগে বিরাট মহাপুরুষরা বলতে এসেছে যে এই ক্ষুদ্র অহং বাবাজীর আখড়ার এক ছটাক শক্তির মানুষ—এক ছটাক প্রেমের ও আনন্দের মানুষ অনন্ত আনন্দ পাবে না। বাবাজীর ক্ষুদ্র মুষ্টি দিয়ে মানুষের অসীম সুখ কামনা সে চির দিন মিটাতে পারবে না। যেখানে এক মুঠি, সেইখানে হাজার লাখ কাঙালের ভিড়, সেইখানে কাড়াকাড়ি মারামারি। যেখানে অঢের অফুরন্ত, সেইখানে শান্তি। তাই বলি ওগো মানুষ বলছে এবার অন্তরের দুয়ার খোল; সেই উর্দ্ধমূলে ভিত গেড়ে তোমার নতুন সমাজ নতুন রাজ- পাট গড়; তা' হ'লে জগতে আনন্দ থৈ পাবে না, মানুষের সভ্যতা আর এক পা এগিয়ে যাবে, শক্তির বামন এই চোদ্দ পোয়া মানুষই ত্রিপদ ভূমি ভিখ্ নিতে গিয়ে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ছাইবে। নর তখন নারায়ণ হবে।

অহংকারী কে?

অহংকারের মানুষ হচ্ছে বাঁধনের মানুষ, এখানে এই অহংকারের রাজ্যে মানুষ আপন কলে আপনি ধরা পড়েছে। অহংকারের ভূতকে আজীবন কত মন্তর তন্তর পড়ে খোরাক জুগিয়ে তুষ্ট করে এই আধারে নামিয়েছি—আমাদের জন্যে ভগবানের আনন্দের হাট থেকে আনন্দ আর শান্তি লুটে আনবে বলে; এখন ভূত আমাদের পেয়ে বসেছে, তাই ভূতের নেশা ভাঙ জুগিয়ে ভূতের বেগার খেটে খেটে আমরা হয়রাণ।

(এখন) "মলেম ভূতের বেগার খেটে,
(ওগো) কোন সম্বল নাইকো গেঁটে।"

বাঁধন যে কত বড় দুঃখু তা' তোমরা রাজনীতি করে, পরের চাকরী করে বুঝেছ—হাড়ে হাড়ে জ্বলে বুঝেছ। মুক্তিই পরম সুখ; স্ব-তন্ত্রই আসল তন্ত্র, আর রাজতন্ত্র গণতন্ত্র বামুন-তন্ত্র মোড়ল-তন্ত্র যে তন্ত্রই বল না কেন—তা' সুখের নয়, ঘাড়ে-চাপা রাজত্বে অনন্ত দুঃখ, অনন্ত বাঁধন, অনন্ত অত্যাচার আছেই।

যে ঘাড়ে চাপে, এবং যার সে ঘাড়ে চাপে দুই জনই বাঁধনের চাপে অধোগতি পায়, পা-চাটা গোলাম আর বদ্-খেয়ালী খাজ্ঞা খাঁ দুজনেই মনে প্রাণে জ্ঞানে হয়ে উচ্ছন্ন যায়।

. বাঁধন তাই সুধু দুঃখ নয়, বাঁধন পাপ, কারণ, মানুষকে যা ফুটতে গড়তে গজাতে দেয় না, যা জীবনের পরিপন্থী—যা দেবকীর বুকের পাষাণ, তাই পাপ। বাঁধন—আসল বাঁধন মানুষের বাহিরে নয়, মানুষের অন্তরে। কারণ আমার মনে যদি মোড়লীর লোভ থাকে, তার জ্বালায় আমি লাখ মানুষকে গোলাম করবই করব। আমার মনে যদি কাম থাকে লাখ বিবি জড় করে হারেম্ বা অন্তঃপুরের পিঁজরে পেলে খুলবই খুলব।

তোমরা ভাব—এ ভারত জুড়ে গণতন্ত্র বা রিপাব্লিক গড়লে ভারত বুঝি সুখের স্থান হয়। ওটা ইংরিজি-কলেজে-পড়া একটা গণ্ড মূর্খতা। আমেরিকায় ও ফ্রান্সে গণতন্ত্র আছে আর বিলাতে রাজতন্ত্র আছে। যে এদের ভেতরকার কল দু'টো চেনে, সে জানে ও-দুটো বন্ধনের এ-পিট আর ও-পিঠ। আমেরিকায় ডিমোক্রাটিক দলের ট্যামিনি হল—ককাস্ (Taminny Hall Caucus) বলে গুপ্ত দল আছে; তাদের কথাই সেখানে সাত কাহন, তারা সভাপতি বাছে, রাজ্য চালায়। এক উইল্‌সন্ সে দলের বাছাই

সভাপতি নয়, তাই সে দলের বিরোধী হতে গিয়ে তলিয়ে গেল। যে আমেরিকার পেটের নাড়ীর কথা জানে, সে জানে ওটা ধন-কুবেরদের সখের গণতন্ত্র, ওখানেও দুঃখ দৈন্য ছাঁদন-দড়ি-গোদাবেড়ী হাজার হাজার মুখস পরে রাজত্ব করছে।

কত দেশে স্ব-তন্ত্রতা স্ব-অধীনতা গড়তে গিয়ে তা' কোন না কোন রকমের পরতন্ত্রতায় দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ মানুষ এত দিন বাহিরটা শুধু সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে, অন্তরে তার বাধন রয়েই গেছে। স্ব-তন্ত্র মানে আপন তন্ত্র, স্ব মানে আত্মা —মানুষের ঘটের ঠাকুরটি। সেই অন্তরদেবতার রাজ্য হ'লে অন্তর বাহির দু'টোর বাঁধনই খসে যায়, ঠিক ঠিক স্ব-তন্ত্রতা হয়। যার মন মুক্ত যার প্রাণ বাসনারাহুর হাত থেকে মুক্ত সেই প্রকৃত মুক্ত। তোমরা যদি লাঠির ঘায়ে মুক্তি পাও, তা' হ'লে সেই লাঠি—তোমাদের হাতের সেই শ্রীকোঁৎকা এই ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে একদিন বাঁধবে আর গরু-তাড়ান করে তাড়াবে। সে রকম অহংকারের রাজত্ব ঢের হয়েছে ; ও বিষয়ে য়ুরোপের ওপর টেক্কা দিয়ে আর বেশী কি গড়বে ? ওরকম রাজ্য ফেঁদে মানুষকে সত্যকার স্বাধীনতা কেউ দিতে পারে নি।

মায়ের ছেলে হয়ে হয়ে বার বার মরে গেলে মা কি করে জান ? এমন যে প্রেমের মা সে পাষাণী হয়ে গঙ্গাসাগরে ছেলে

মানৎ করে ; আর তার পর যে ছেলে হয়, তাকে ভেলায় করে সাগরে দেয়। দিয়ে তটে বসে থাকে সাগরের ঢেউ তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে বলে। তোমরা যা'রা এই নবযুগের মানুষের চিরমুক্তি গড়তে যাচ্ছ, তাদের মনের অহঙ্কার-সন্তানকে সাগরে দিতে হবে। তোমাদের অহঙ্কারের ছেলেও বার বার জন্মেই মরেছে ; অহঙ্কারের সেই সব পশু জন্মে এতদিন যা' রাজ্যপাট করেছ মানুষকে তা সুখের বদলে দুঃখ দিয়েছে। তাই এবার অন্তরের পরম সাগরে ভেলায় করে অহঙ্কার শিশুকে ভাসিয়ে দাও ; তারপর সে সন্তান যখন ফিরে পাবে, দেখবে সে দেবতার বাহন হয়ে ফিরে এসেছে, তার দেহটা পশু হ'লেও অন্তরে আর পশু নয়, সে যে সিংহবাহিনীর সচল সিংহাসন—তাঁর মহাযুদ্ধের শক্তিময় জীবন্ত রথ।

অহঙ্কার যায় না, সে রূপান্তর হয়ে দেবতার হাতের বাজ হয়ে থাকে। অহঙ্কার মানুষের ঘাড়ে চাপে, কিন্তু দেবতার সেবা করে ; মানুষ যদি আত্মবশী হয়, তা'লেই পরবশতা ঘোচে,—অন্তরে মুক্তি না থাকলে বাহিরের মুক্তি শেকলই হয়ে দেখা দেয়। যে নিজে সতী তার চোখের চাহনিতে জগত টলে যায়, আর যে সমাজের ধরে বেঁধে গড়া সতী তার সে বস্তু রাখবার জন্ত দেয়াল পিঁজরে ঘোমটা ও শাস্তরের পাহারায়ও কুলোয় না। ওগো মানুষ! মুক্ত হও,

সমতার সুখ-আসনে ব'সে আপনার শান্ত হাতে—আপনার বিরাটের হাতে সমস্ত সমর্পণ কর, তখন দেখবে—অহংকার-মুক্ত তুমি বিরাট, তুমি স্বরাট, তুমি জগন্মূর্ত্তি, তুমিই বিশ্বরূপ। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব যদি একাধারে থাকে সে তুমি। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "এ অহং কার ?" এ অহং যে কার যে দিন তা' তুমি ত্রিনেত্র খুলে দেখবে, সেই দিন তুমি ঠিক ঠিক অহংকারী হবে, সে দিন মানুষের জয় হবে। কিন্তু যে শক্তিকে ভয় করে সে তামসিক, আর যে শক্তিকে জয় করে সে রাজসিক। তোমরা সিংহবাহিনীর সন্তান, মায়ের হাতে দশপ্রহরণ আছে, বরাভয় কি নাই ? ও যে সামঞ্জস্যের মা, জীবন-বেদীর বীণাপাণি, তম মায়ের দৃঢ় আসন, রজ মায়ের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-করা দশ ভুজ আর সত্ত্ব মায়ের জ্ঞানজ ত্রিনয়ন। এই তিনের মিলনে তোমার অহংকার। এ হেন ভোগ-মোক্ষদায়িনী অন্নপূর্ণার তুমি চিরভিখারী শিব, আপন ঐশ্বর্য্যের ভিক্ষা আপন শক্তির হাতে এমনি করে আপনি নিচ্ছ।

অহংকার যায় কিসে?

অহঙ্কার যায় কিসে? আসল কথা অহঙ্কার যায় না, কিন্তু রূপ বদলায়, কোপনী আঁটা কাঙাল রাজার বেশ পরে রাজতক্তে বসে। এই দীন নিঃশক্তি ঘট-টুকুর অহংকার বড় দীন, বাঁদরের মত ল্যাজ উঁচু করে সে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে বেড়ায়; কুয়োর ব্যাং কুয়োর মাঝেই লাফ-ঝাপের কর্ত্তা—তাই নিয়েই তার বড়াই। মানুষের জীবনের গণ্ডী যেমন বাড়তে থাকে, তার দু'হাত বুকখানা শক্তিতে জ্ঞানে বড় হয়ে যেমনি দশ হাত হয়, অমনি তার ছোট নজর ঘুচে গিয়ে বড় নজর আসে। যেমন দু'খানা গাঁয়ের পাট্টাদার গরীব পোদের পোকে ধরে অকারণে দশ ঘা জুতো মেরে সুখ পায়, দশ হাজার মাইলের রাজত্বের রাজা কিন্তু লক্ষ প্রজাকে সুখী করে সুখ পায়, মানীকে মান দিয়ে আনন্দিত হয়। যে রাজপুত্র মারধর করতে গেলেও নিজের সমান রাজার ছেলে না হলে খোলা মাঠে লড়ে বাউ-কসাকসি করে তার মন ওঠে না।

সেই রকম তোমার আমার কাঙাল অহঙ্কারও অহঙ্কার আর বিবেকানন্দের জগত্তারণ অহঙ্কারও অহঙ্কার। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী জগতশিল্পী ভগবানও কম অহংকারী নয়, তারই অনন্ত বিশ্বগ্রাসী অহংজ্ঞান এই ক্ষুদে ক্ষুদে ঘটে "আমি আমি" করে বাজছে। তফাৎ এই যে ভগবানের অহংকার, বুদ্ধের বিশ্ব-হিতের অহঙ্কার মুক্ত অহঙ্কার, তা' তো হবেই— মানুষের যত বেশি শক্তি তার বাঁধন যে ততই কম। সাধনায় আত্মসমর্পণ করা মানেই অহংএর গণ্ডী ঘুচিয়ে দেওয়া, মানব জ্ঞানকে ভাগবত জ্ঞানের মাঝে অসীম অনন্ত পূর্ণ ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া মন যদি অকপট হয়, সত্যি সত্যি কায়মনে জ্ঞানে যদি দীনতা থেকে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি চায়, হলে ওপর থেকে কৃপা নামে, তার ছোঁয়ায় এই ক্ষুদে আধার ভরে গর গর করে অপূর্ব্ব শক্তি কোথা থেকে এসে সব বাঁধন সুখনিবিড় শান্তির মাঝে আলগা করে দেয়। এই যে দেখছ, নিটোল কঠিন ক্ষুদ্র দেহ, ঐ যে অনুভব করছ শিরায় শিরায় চঞ্চল উষ্ণ বাসনা-ত্মক প্রাণ, ও দুই-ই বিরাট মহান শক্তিময় হয়ে যায়। কিন্তু অকপটে চাইতে হয়, অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অটল আসনে দিন রাতের গণনা ছেড়ে বসতে হয়, তখন বুদ্ধি মন প্রাণ দেহ অবধি একে একে মুক্ত হতে থাকে। সে অবস্থায় মানুষের যা আছে সবই থাকে—কেবল রূপান্তর হয়ে থাকে। সে

ভিখারীকে রাজবেশে তখন আর চেনা যায় না, পুরাতন নূতন হয় বটে কিন্তু সে নূতন হচ্ছে a devine revolution, ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য মানুষে প্রকাশ—সেই রূপান্তরেরই নাম মানুষের স্বারাজ্য লাভ।

তোমার এই অহং ভগবানের সমস্ত সত্বা, সমস্ত শক্তি, সমস্ত আনন্দের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের পিছনে যদি সে অনন্ত ভূমা ও মহানকে পাও তা' হ'লে এর শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের আর অবধি থাকে না। জীব-চন্দ্রে ভগবৎ-সূর্য্যের প্রকাশ, এই অনুপম মর্ত্তটুকুর মাঝে সকল স্বর্গের মাধুরী ধরা আছে। আপনহারা হয়েই মানুষ না এত দীন আর স্ব-প্রতিষ্ঠ মানুষই না দেবত্বের অধিকারী। এই অহং ঘুচে যে স্ব থাকে তা' শুধু বৃহৎ নয়, তা' পূর্ণ জ্যোতিষ্মান - সত্যের সত্বায় নিবিড় ও আনন্দঘন।

———

মনের ওপরের কথা।

এ যুগের কথা বড় কঠিন কথা। অন্যান্য যুগে সাধকরা সাধনায় শুদ্ধ হতেন জীবনকে যোগময় করবার জন্য। তখন মানুষ ছিল মুক্তির পাগল, জরা ব্যাধি দুঃখ দৈন্যের জগৎ থেকে নাড়ীর বাঁধন—কামনার পাশ কেটে আনন্দ-নগরে বসতি করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। মানুষ ক্ষুদ্রতা ও দ্বন্দ্বের জ্বালা কোন গতিকে এড়িয়ে মুক্তি পাবে, এই ব্যক্ত ভগবান ছেড়ে তাঁর জগদতীত পরা সত্তায় ডুব দেবে; আর যাবার সময় সঙ্গের সাথী দশ জনকে মায়ার বাঁধন কাটবার জন্য কৌশলটি দেখিয়ে দিয়ে নির্ব্বাণ মুক্ত হয়ে যাবে। এই যে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যোগ সাধন এরও একটা লক্ষ্য ছিল।

মানুষ এতদিন যে আপনার সত্তার মাঝে স্বর্গের দুয়ারে অর্গল দিয়ে মাটির ঘরকন্না নিয়ে বসে আছে, তাতে দুয়ারটা হঠাৎ খুলে স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করে দেওয়া ভাল নয়। এক-

ঘটি জলে তৃষ্ণা দূর হয়, এক পুকুর জলে স্নান করে মানুষ স্নিগ্ধ হয় কিন্তু সেই জলই বান ডেকে এলে সন্তরণে অপটু ডাঙার মানুষ ঘর-দুয়ার সমেত তা'তে ডুবে মরে। তাই মানুষকে তারই নিজের অন্তরের স্বর্গে তোলবার চেষ্টা প্রকৃতির মাঝে এমনি ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারায় হয়ে এসেছে। মনের আকাশ ফেটে ভগবানের সোণার জ্যোতি আজ পর্য্যন্ত অনেক মানুষের জীবনে আলোর রেখা কেটে দিয়ে গেছে, তাদের দেখেই আমরা বলি—'তোমার যারে হয় গো কৃপা, অরূপ তার রূপের ছটা', তারাই হ'লো সাধু সন্ত ফকির। এই সত্যের একটুখানির চমকে জীবন চিরদিনের জন্ম আলোয় আলো হয়ে যায়, যত ভাঙা চোরা পুরাতন সব এই সুখের রঙে ও সত্যের স্পর্শে জ্বলজ্বলে নূতন হয়ে দেখা দেয়। এ মানুষ আর সে মানুষ থাকে না। তবেই দেখ, উপরের আকাশ ফেটে মনের মাঝে এক ঝলক বিজলীহানা আলো পেয়েই মানুষের এই দশা।

আমরা যে কথা বলছি তা' এর ঢের বেশি, ঢের ওপরের কথা। বিজ্ঞান মানে মন তো আদৌ নয়, এই মন বুদ্ধি প্রাণ দেহ ইত্যাদি মানুষের যা' কিছু লোহার যন্ত্রপাতি সবই পরশমণি ছুইয়ে সোণা করে তারপর মনের ঢাকনি একেবারে খুলে দেওয়া, যাতে সেখানকার আলো ও সত্তা এখান অবধি

নেমে আসে ; এই মানুষ যে সেই ভগবান তা শুধু জ্ঞানে নয়, আনন্দে নয়, শক্তিতে প্রাণে দেহে সকল ঘটে মধুর হতে মধুর করে পূর্ণ হতে পূর্ণ করে তাই প্রতিষ্ঠা করা—জীবকে রূপান্তর করে শিব করা।

মনের মাঝেও ভগবানের সত্তা—এই বিজ্ঞানের জ্যোতি নামে, কিন্তু টেকে না ; তাঁর জ্যোতি সে রাজ্যেও উদয় হয় বটে কিন্তু বিকৃত মলিন হয়ে দেখা দেয়। "এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি"—মন সবই ভেঙে ভেঙে দেখে, পূর্ণ সত্য দেখতে পায় না, কারণ ভেদই মনের ধর্ম্ম।

না ভেঙে ভেঙে না চিরে চিরে, বিশ্লেষণ না করে, মন এক পা চলতে পারে না ; সে এক চোখে একবার একটা আংশিক সত্যই দেখতে পায়, সবটা পায় না। মানুষকে দেখতে হলে মন চোখের সাহায্যে একে একে তার আপাদ-মস্তক দেখে একটা মন গড়া ধারণা করে নেয়, তাও শুধু মানুষের বাহিরটা নিয়ে, তার স্থূল জড় রূপের আকারটা নিয়ে। এমনি করে হাৎড়ে হাৎড়ে মন জ্ঞান পায় বটে, কিন্তু যতক্ষণ সে তা বাক্যে রূপ না দেয় ততক্ষণ সে জ্ঞান কাজে আসে না, তার কিছু পাওয়াই হয় না। এমনিতর কুড়িয়ে কুড়িয়ে অনুমানে আন্দাজে পাওয়া তার সেই জ্ঞানগুলির

মাঝেও কত বিরোধ, কত অমিল, কত ভুলভ্রান্তি থেকে যায়। সে মানস-রাজ্যে একটা বিরাট সত্যে সব ক্ষুদ্র সত্য গাথা নয়, একটা চরম কিছু বুঝলে সেখানে সব বোঝা যায় না। শুধু কি তাই? মন যখন একটা একপেশো সত্য ধরে, তখন সেটাকে সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড় অতিকায় করে তোলে যে, সেটা তো বিকৃত হয়ই, উপরন্তু তারে চাপে বাকি সব সত্যও মারা পড়ে। মন সীমার জিনিষ, খাঁচার পাখী, খাঁচার ফাঁক দিয়ে তার মহাকাশ-দর্শন। সীমায় বাঁধা খোঁড়া মন সীমার জগতের ছোট ছোট খুটি-নাটির রাজা, তাই নিয়ে তার বেসাতি।

বিজ্ঞান তা নয়। বিজ্ঞান হ'ল ধ্রুবদৃষ্টি; এক চোখে সে ত্রিলোক দেখায়। বিজ্ঞানের দর্শন ধ্রুব তো বটেই, উপরন্তু তা' সত্য দর্শন, পূর্ণ দর্শন, নিখুঁৎ দর্শন আবার বৃহৎ দর্শন। বিজ্ঞানের চোখে কেউ মানুষকে দেখলে তার কিছুই দেখতে বাকী থাকে না; আয়নার মাঝে যেমন মুখ স্পষ্ট দেখ, এমনি করে তার চরিত্র তার মূল সত্য অবধি বিজ্ঞানে চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে। যখন রামকে দেখি, তখন তার মাঝে স্থূল রাম, প্রাণময় রাম, সূক্ষ্ম রাম, মানস রাম এ সকল গুলিকেই দেখি এবং এ সব কয়টির পেছনে দেখি সেই পরম সত্য যে সত্য রামরূপ ধরেছে। শুধু কি তাই, জগত

চরাচরের সকল সত্যের মাঝে সেখানে রাম এক সুন্দর মিলনে পরমের বুকে বিরাজ করছে। ইচ্ছা হ'লে তার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তার জন্মজন্মান্ত সকলি বিজ্ঞান নেত্রে ভেসে ওঠে। তাই বিজ্ঞান হ'ল শিবদৃষ্টি, তাই তা' মনের ঢের ওপরে।

মন ভেদের মাঝে জগৎ দেখায়, বিজ্ঞান আপন অঙ্গের মাঝে বিশ্বরূপ ধরে সেই জগত আর এক রকম করে দেখায়। বিজ্ঞান জাগলে সে সত্যদর্শীর কাছে আমাদের এই ভাঙাচোরা শোক-দুঃখের ভুল ভ্রান্তির রাগ-দ্বেষের খণ্ড জগত ঠিক এ রকমটি আর থাকে না। এখানে যা মিলছে না, এখানে যা অপূর্ণ, দ্বন্দ্বময়, বিরোধী, সেখানে তাকে পূর্ণ করে সত্য করে আনন্দঘন করে পাই, বৃহৎ বিশ্বকে সত্যের মাঝে ধরে তাকে তার আপন নিজস্ব সত্যের অভিব্যক্তি রূপে পাই। সেখানে জ্ঞানের অবধি নাই, 'সানুম্ সানুম্ আরুহৎ'—অনন্ত লীলায় সত্য হতে সত্যে সেখানে অভিসার, আনন্দে হতে আনন্দে সেখানে প্রতিষ্ঠা, শক্তি হতে শক্তিতে সেখানে বিধৃতি।

মনের ওপরের কথা

মন হল দ্বন্দ্ব দ্বিধা অনুমান ও সন্দেহের রাজ্য,—সে যেন এক আধ-আলো আধ-আঁধারের ছায়াবাজীর দুনিয়া। বিজ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানের জগত—জ্যোতির ধ্রুবলোক। পূর্ব্বেই বলেছি, "বিজ্ঞানের দর্শন ধ্রুব দর্শন তো বটেই উপরন্তু তা সত্য দর্শন, পূর্ণ দর্শন, নিখুঁত দর্শন আবার বৃহৎ দর্শন।" আমাদের ক্ষুদ্র-দৃষ্টি এই মন জগতকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে অঙ্গে অঙ্গে দেখায়; শুধু তাই নয়, দুনিয়াকে আমার সত্তা হতে পর করে—জড় অনাত্ম বস্তু করে, বাহিরে ধরে দেখায়। তা'তে যে ঝাপসা ঝাপসা চোখেরদেখা জ্ঞান হয়, তা'তে জগতকে ঠিক বুঝতে পারিনে, শুধু তার বাহিরটা কোন গতিকে চিনে রাখি। বিজ্ঞানে কিন্তু সেই জগৎকে "আপন অঙ্গের মাঝে বিশ্বরূপে ধরে" আত্মধন করে—অন্তরতম করে দেখায়। তাই সে জ্ঞান বড় নিবিড়, বড় প্রকট, বড় নিখুঁৎ, বড় পূর্ণ।

বিজ্ঞানের এই ধ্রুব দর্শন এলে এই বহুবিচিত্র খণ্ডবিখণ্ড

দুনিয়া এক অখণ্ড সত্তা হয়ে দেখা দেয়, কারণ স্বরূপতঃ সে তো বহু নয়—সে যে একই। আবার তখন সেই ভাগবত জ্ঞানে বোঝা যায়,সেই এক অখণ্ড বস্তু আমা হতে ভিন্ন নয়, বাহিরের জড় আবর্জ্জনা নয়; তা আমারই বর-অঙ্গ—"প্রাণের প্রাণ সে যে প্রাণ-রমন।" এই এক-জ্ঞান আর আত্মজ্ঞানই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। তখন সেই মহাসত্যে বা বৃহৎ সত্তায় সব ভেদ সব খণ্ড এক নূতন সত্যে সত্য হয়ে ওঠে, নূতন মধুতে মধুময় বিশ্বরূপ ধরে। তখন ভেদ ভেদও বটে আবার আমারই অভেদ শ্রীঅঙ্গও বটে।

বিজ্ঞানের অবস্থায় তোমার অন্তর চক্ষু অনন্তে গিয়ে দাঁড়ায় আর সেখান থেকে জগতকে পূর্ণ ভাবে দেখে। তখন সে দৃষ্টিতে দেখা যায়, যে, কোন্ উপাদানে কোথা থেকে কি করে এ দৃশ্য চরাচরের উৎপত্তি হয়েছে এবং স্বরূপতঃ এ বিশ্বই বা কি তত্ত্ব। তাই বিজ্ঞানের জ্ঞান খাঁটি সত্যজ্ঞান ও নিখুঁৎ পূর্ণ-জ্ঞান। সে চোখে ছোট বড় কোন বস্তুরই কোন কথাই জানতে দেখতে বা বুঝতে বাকি থাকে না, সে ভাগবত দূরবীক্ষণের মাঝে সবই ধরা পড়ে, তার পরিধির মাঝে সবই এসে যায়।

এই ভাগবত জ্ঞান সত্য-দর্শী (truth-conscious) ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান। মনের যত চিন্তা, ভাবনা, অনুমান বা

সন্দেহের দুঃখ এখানে নাই। বিরাট সূর্য্যের মত সে বিজ্ঞান নিমেষে সব ব্যক্ত করে, তাকেই বলে "যমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্", সে আপন লীলায় নিজস্ব সহজ কিরণে নিখিল সত্যই চোখের কাছে মেলে ধরে। এ যেন মানুষের পূর্ব্ব স্মৃতি, জীব হয়ে যা' সে ভুলেছিল ভগবান হয়ে আপন বিরাট বিশ্বরূপী অন্তরে তাই আবার নিঃশেষে স্মরণে এল—যেন এক মহাজ্যোতির ঝলকে হারানিধি কুড়িয়ে পাওয়া গেল।

মন অজ্ঞান ভূমি থেকে হাতড়ে হাতড়ে জ্ঞানের দিকে চলে, যেন অজ্ঞানের কালো পর্দ্দায় মনের জ্ঞান জ্বল জ্বল করে দেখা দেয়, তবু কি সন্দেহ ও ঘোচে? কত জুড়ে ভেঙ্গে কত যুক্তি তর্কে নিঃসংশয় করেও মনে কূল পায় না। বিজ্ঞান কিন্তু সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ঘোমটা তুলে তার নিখিল মাধুরী অনাবরণ করে দেখাতে পারে; কারণ সে যে তার নিজেরই মুখ, জগতের সকল সত্য যে সেই সত্যঘন শিবেরই অঙ্গ। ভগবানে সব ছেড়ে দিলে—সর্ব্বধর্ম্ম সমর্পণ করতে পারলে সেই শান্ত স্থির আধারে মন অল্পে অল্পে নিঃশেষে গুটিয়ে যায়, আর তার জায়গায় এই শিব দৃষ্টি জাগে, তখনই নর নারায়ণ হয়।

———
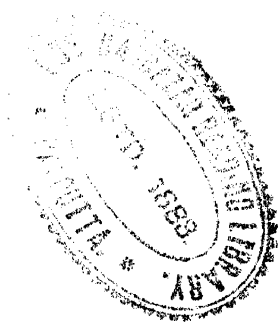
পঞ্চম পর্ব্ব

নূতন মানুষ।

মানুষের জোয়ার

মানুষের জোয়ার আসুক, অনন্তের বেলাভূমিরূপী তোমায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে আমাদের শক্তির ভগবান বয়ে আসুক, আমার জ্ঞানের দেবতা ঐ অন্তরের হিমাচল গলে ঝরে পড়ুক দেশের আনন্দের আত্মা নতুন জগৎ রচনায় ভরে আসুক।

মানুষের জোয়ার চাই। ছোট কাজের ফোঁপর দালাল মানুষ নয়, বক্তৃতার আসরের—বাহবার পুতুলবাজীর মানুষ নয়, সংযমের নামে দীন আত্মঘাতের মানুষ নয়। ঋদ্ধির মানুষ চাই, সব বাঁধনহারা মুক্তির মানুষ, অসাধ্য সাধনের শক্তির মানুষ চাই।

"কেবল ক্ষ্যাপার মত খুঁজে মরিস্।
কোথায় রে সে রতন আছে ?"

কোথায় খুঁজছ সে মানুষের অগাধ সিন্ধু যে তোমারই মাঝে রয়েছে। মানুষের গড়া দেবতা নিয়ে এতদিন ব্যস্ত ছিলে, নিজের রাগ দিয়ে কাম দিয়ে ফোঁটা চন্দন উপবাস—মন্ত্রতন্ত্র

দিয়ে মনের মত দেবতা—দীন নিজেকেই পূজা করছিলে, তাইত বৃহৎ মানুষের খবর পাও নি।

এবার অন্তর দুয়ার খুলে দাও, দেবতার মানুষ আসুক, তোমার সত্তার উঁচু আকাশ—ছোঁয়া হিম চূড়াটি গলে ওপর থেকে বয়ে এসে ব্রহ্ম প্লাবনে এই জগৎ ডুবিয়ে নতুন করে গড়ুক।

ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী মানুষ, বিষ্ণুর রক্ষাকারী মানুষ, শিবের ধ্বংসকারী মানুষ তোমারি আমারি মাঝে চিরদিন রয়েছে। ছোট কাজের লোভের মাঝে শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা জাগে না, নিজেই তুমি অগস্ত্য হয়ে আপন আত্ম-সিন্ধু গণ্ডুষে আপনি পান করে বসেছিলে। কারণ নিজেকে—নিজের মুক্তিকে তোমার বড় ভয়,—নিজের হাতে নিজেকে সকল রকমে ছেড়ে দিতে তাই পার না।

আগুনের লোভে বাইরে ছুটাছুটি করলে শিব জাগে না। ত্যাগের নামে নিজেকে বঞ্চিত করে দীন করে ফেললে মানুষ ছোট হয়ে যায়। তুমি মুক্ত থাক, ছোট "আমি"—এই জাবকে তোমারি বড় "আমি"র হাতে যত্ন করে তুলে দাও, তোমার অনন্তকে এই দেহরূপ শেষ শয়নে নামতে দাও, দেখবে তোমার সৃষ্টি তোমার স্থিতি তোমার প্রলয় বেলা উপচে পড়বে। চেয়ে চেয়ে কাঙাল হয়ে এতদিন যা' পাওনি,

আজ সব দিয়ে ফেলে কত অনন্তগুণ বেশী করে সেই দেওয়া জিনিস ফিরে পাবে।

আমাদের সোনার ভারত শ্মশান হতে চলেছে তার কারণ দেশে মানুষ নাই। মনুষ্যত্বের পুঁজি আমাদের ফুরিয়ে এসেছে; ফুরিয়ে আসবারই কথা। কারণ আমরা এতকাল ধরে খরচই করে এলাম, জমার ঘরে কিছুই পড়েনি। যদি কয়েক ছালা টাকা উঠানে টেনে এনে ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বস্তা খুলে কেবল খরচই করে যাই, তা' হ'লে দেউলে মেরে গিয়ে গণেশ-উল্টোন আর আশ্চর্য্য কি? মানুষের শক্তির ঘর যে কোথায়,চিন্তামণির কোন্ নাচ-দুয়ারে যে মানুষের মণি-রত্ন জমা আছে, তা' আমরা ভুলেই গেছি! কোথায়ও যে গিয়ে মনের দুয়ারে অর্গল দিয়ে বসে আবার শক্তি আহরণ করতে হয়, এ কথা শুনলে আমাদের লক্ষ্মীছাড়া খরুচের দল হাসে!! বলে, "হুঁ! নাক টেপাটেপী ত?" তারা বলে রামচন্দ্র যুদ্ধে যাবার আগে শক্তির পূজা করে অস্ত্র পেয়েছিলেন, ইন্দ্রজিৎ কি করেছিল, ওসব হ'ল পুরাণ কথা!!!

এর ফল হয়েছে কি, দেখেছ? শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগের আগেকার বাঙলাকে (বা ভারতকে) স্মরণ কর আর এখনকার দেশের দিকে চেয়ে দেখ। তখন বাঙ্গলায় বা ভারতের অসাড় ছিল সর্ব্বাঙ্গই। সারা দেশটা এমন মরণ

মরেছিল যে দেশে মানুষ এক রকম বলতে গেলে ছিলই না ;
সেকালে বিদেশী ধারা ধরে অন্তরে বাইরে "জাত-ফিরিঙ্গী জবড়
জঙ্গী" সেজে তবে arise awake বলে দেশ-আত্মাকে
জাগান যেত। বিলিতী মদের পিশাচ-নেশায় রক্তচক্ষু পাকিয়ে
দেশ টলতে টলতে উঠে দাঁড়াত আর টাকি পৈতে তেলক
নোলক ঢেকে সাহেবী ষণ্ডামার্ক আওয়াজে কংগ্রেস মণ্ডপ
কাঁপিয়ে বলে উঠতো, "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে-এ-এ-এ", তার পর
পতন ও মূর্চ্ছা ! বার বার দেশ-উদ্ধারের নামে এই বিলিতি
মাৎলামোই চলেছিল। সেটা ছিল অসাড় যুগ, মানুষ ছিল
দেহ মন বুদ্ধিতে পক্ষাঘাতের রোগী।

এখন শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে ও রক্তরাঙা সঙ্কীর্ত্তনের পর
আজ দেশ-আত্মা জেগেছে। কিন্তু এ দৃশ্যও অতি অদ্ভুত। দেখে
মনে হয় একি নাগরাজ্য নাকি ! চারিদিকে চেয়ে দেখ,দেখবে
চমৎকার সব উঁচু ভাব কিন্তু আধারগুলো সেই পুরোণো,
খেলো, দুর্ব্বল। নাগ বা মৎস্য দেশের মত ওপরটা মানুষ,
নীচেটা হয়তো মাছ বা সাপ বা ঘোড়া। প্রাণগুলো খুব
বড়, কত কি করতে চায়, কিন্তু হাত-পা ঠুঁটো, অত বড়
প্রেরণার অনুযায়ী সৃষ্টি করবার শক্তি ইন্দ্রিয় বা বিগ্রহ
গজায় নি। মানুষের মাঝে পুরাণ যুগের দুর্ব্বলতা অপগুন
আর নতুন যুগের ভাব ও সদগুন মিশে এক অদ্ভুত খিচুড়ি

পাকিয়ে তুলেছে; এ আধজাগা আধ-ঘুমন্ত আধ-মানুষ আধ-অতিমানুষের জাত দিয়ে না যায় কিছু করা, না যায় পড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।

এতকাল ভারতের শক্তির ঘরের দরজা খুলে যেই এক. এক জন বড় মানুষ বেরিয়ে এসেছে, অমনি তাদের পেছনে সিংহদ্বার ঝন্‌ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দেশ জুড়ে সেই রামমোহনী যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখ শুধু বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া অশ্বত্থ বট গাছ, আর বাকি সব তেলাকুচা আশশ্যাওড়ার বন। পালে পালে অতি খেলো সাধারণ মানুষের ভিড় আর তাদের মাঝে মাঝে বঙ্কিম-ভূদেব-জগদীশ-রবীন্দ্রের বড় বড় মহীরুহ। দেশের সমষ্টি মন চারপোয়া দশায় হামাগুড়ি দিচ্ছে।

এখন জীবন-জোয়ার এসেছে, কিন্তু এ জীবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? কে যে কি করবে কেউ জানে না, উপদেশ ও উপদেষ্টার অরণ্যে সব বাঁশ বনে ডোম কানা। এখনও আমাদের পূর্ণ সত্তার ঘরে চাবী দেওয়া, তাই স্থির ক্ষুরধার অগাধ বুদ্ধি নেই, নতুন জগত রচবার দেব দুর্লভ সামর্থ্য নেই, অসাধ্য সাধন করবার সে হিন্দু সে মুসলমান এখনও দেশে নেই। তবে তারা যে আসবে, সেইটুকু বুঝতে পারা গেছে বলেই যা' আশা।

মানুষ গড়া

মানুষের সভ্যতা তিন থাক উঠেছে। অসভ্য যুগে ছিল দেহের ও প্রাণের থাক্, আর এতকালের য়ুরোপ এসিয়ায় নড়াচড়ার পর হয়েছে বুদ্ধির থাক্। দেহ-সর্ব্বস্ব পশুকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচারের মধ্যে তুলে দিয়ে মানুষের যুগ মানুষকে সার্থক করেছে। এই mental age এই এখন বুদ্ধি-সর্ব্বস্বের যুগ বুঝি এবার প্রভাত হবে। এ যুগে সব যে যার হাতে বই পড়া কলেজী বিদ্যে বুদ্ধির বুলস্ আই লণ্ঠন হাতে অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াচ্ছে ;—ঐ লণ্ঠনের বা এক ছটাক বুদ্ধির আলোয় তাদের পথ চলা, পা টিপে টিপে এগিয়ে যাওয়া অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বুদ্ধিগর্ব্বী এই জাতের দিন বুঝি বা ফুরিয়ে এল।

একদিন পশু-মানুষের দিন ফুরিয়ে জ্ঞানী-মানুষের (intellectual) যুগ আরম্ভ হয়েছিল, আর আজ বুদ্ধির মানুষেও আর কুলোচ্ছে না। মানুষের ইতি করতে নেই, এই জ্ঞান এসে মানুষকে কোন্ অচিন্ত্য নব রাজ্যে আর এক ধাপ তুলে দেবার আয়োজন করছে। বিজ্ঞান দর্শন সবাই মানুষকে ঠেলে নতুন যুগের সিংহদ্বারে নিয়ে চলেছে, সবাই এক বাক্যে বোঝাচ্ছে যে সত্য সত্যই মানুষের ইতি করতে নাই।

পুরাণ ইমারত ভেঙ্গে তবে নতুন প্রাসাদ গড়তে হয়। একেবারে মুক্তক্ষেত্র চাই, তবে ত নতুন সৃষ্টি হবে। ইউরোপে

সব সংস্কার সব বাঁধন সব পদ্ধতি ভেঙে যাচ্ছে, মানুষ সব দিক দিয়ে মুক্ত বাঁধনহারা হচ্ছে, কারণ তারা নতুন সৃষ্টি নতুন গাঁথনীতে মন দেবে। বাঁধা সংস্কার-কাণা মনে নতুন পথে এগোন যায় না, পুরোণর ভয়েও পেছু টানে মানুষ কেবলি. যাই যাই করে আর পেছু চায়। ভারত বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভরেও মানুষ সংস্কার-মুক্ত এবং সব দিক দিয়ে স্বাধীন হতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু এখনও সব শিকল খসে নি। এখনও দেখবে আমেরিকা ফ্রান্স ইংলণ্ডের মেয়ে পুরুষ নিজেকে নিয়ে যেমন নূতন গঠন দিতে পারে, আমরা অতটা পারিনে।

নতুন যুগের নতুন ধাপে মানুষ যে উঠতে যাচ্ছে তা' যে কি সেটা জীবনে ফলিয়ে জগতকে বুঝাতে হবে। সেই পথেই মানুষের শক্তির অখণ্ড ঘর, সেই ঘরের সিংহদ্বার এবার খুলবে। মানুষ নিজের মধ্যে শিবকে দেবতাকে অতি-মানুষকে খুঁজে পাবে। বুদ্ধির চেয়ে বড় আলোয় মানুষ সুখের চরম ঘর এবার গড়ে নিয়ে আনন্দবাজার বসাবে। কে এ মহা শ্মশানে জেগে আছ, আজ আপনাকে অফুরন্ত করে খুঁজে পাও, জীবকে যন্ত্র করে শিব জগৎ জুড়ে খেলুক। মানুষ ফুরিয়ে এবার দেবতা হোক।

কাণ্ডারী কই?

আজ আমাদের এই জাতীয় তরীর নেয়ে নেই, কাণ্ডারী-হীন তরীখানি মৃদু মৃদু দক্ষিণা হাওয়ায় নিতান্তই বিধাতার ইঙ্গিতে কূলে ভিড়তে ভেসে চলেছে। নেয়ে কে? যে অকূলে কূল দেয়। সে রকম পাকা মাঝি সাগরের দিশাহারা পাথারেও সদাই সজাগ; যেখানে দিগ্বিদিক নেই, সেখানে সে দিক চেনায়; যেখানে তালগাছ প্রমাণ ঢেউয়ের টাল-মাটাল জলে ভরাডুবীর মরণ কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে, সেই অস্থির উত্তাল অশরণ ভয়ের মাঝে পাকা মাঝির হালখানিতে কত স্থিতি, কত শরণ, কত ভরসা। যেখানে অকূল অনন্ত বিপথের মাঝে পথ বলে কিছুই নেই সেখানে সুপথ মাঝিই দেখায়, তাই তেমন পরমশরণ কাণ্ডারীর তরী কখনও ডুবেও ডোবে না।

তোমার আমার জীবনের ছোট জেলে ডিঙ্গিকে কূল দেয় কে? জগতের কত শত দেশবিদেশের জীবন-পণ্যের মহাজনী নৌকাগুলিকে কূলে ভিড়িয়ে জগতের হাটে

বিকিকিনি করায় কে? বিশ্বের সারা মানব জাতির বিরাট মানোয়ারীজাহাজেরই বা দিশারী কোথাকার কোন জন? একই নেয়ের ইঙ্গিতে একই হালে কি দুনিয়ার সব নৌকা চলছে না? জগতের সব মাঝিই কি পাড়ি জমাবার পথে সেই পীরের নামে অভয় যেচে "বদর বদর" হাঁকে না? তবে তো সবারই কাণ্ডারী—নায়ের নেয়ে সেই একই ভগবান।

তা' বটে, তবে কখন কখন সে রূপ নিয়ে আসে মানুষ-মাঝির পারাপারের খেয়ায় দু'দণ্ড বসতে, চরণ-স্পর্শে তার কাঠের নৌকার সব কাঠ সোনায় সোনা করে দিতে। তখন মানুষ সেই মানুষ-মাঝির কেরামৎ দেখে অবাক হয়, তার রূপের মাঝে অপরূপ অরূপ মাধুরী দেখতে পেয়ে পরম মানুষকে চিনে নেয়, সবারই নৌকা তখন একসাথে শোভা-যাত্রা করে পাড়ি দিয়ে কুল পায়।

তাই বলছি এখনও তা' হয় নি। এখনো আমরা পাটনীহারা-নৌকাখানা জলে ভাসিয়ে মাঝ দরিয়ায় ঢেউ খাচ্ছি। কোথায় যাব জানিনে, যারা নৌকা বেয়ে চলছি তারাও কুল চিনি নে, তবু কুলে পৌছে দেব এই আশ্বাস দিয়ে নৌকাভরে যাত্রী নিয়েছি। কত আঘাটাকে ঘাট বলে সেই বনে জঙ্গলে হাটের যাত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমরা নামিয়ে দিতে চাই, কারণ যা'তে আমাদের খেয়াবন্ধ না হয়, যশ মান

অন্ন-বস্ত্রের ব্যবসা যাতে মাটি না হয়, তা' তো স্বভাব-ধর্ম্মে আমাদের করতেই হবে।

যাত্রী বোঝে না, তারা গণ্ডগোল করে বলে, "এ ঘাট নয়, এখান দিয়ে বনের মাঝে কাঁটা-ঝোপে হাটের পথ নেই।" তা' কে শোনে? সন্দেহ দ্বিধা অজ্ঞান নিয়ে যাদের ব্যবসা তারা তো দেখে পথ হাঁটে না, সাহসী সওদাগরের পণ্যতরী অচিন দেশে যাত্রা করলে আঘাটায় লাগতে লাগতেই ঘাট খুঁজে নেয়। অন্ধকারের পাগল ঝড়কে সম্বল করে নৌকা ছাড়লে তার বেগে নৌকা চলে বটে, অপথ বিপথ দিয়ে এগোয় বটে কিন্তু দিনের সূর্য্য না উঠলে কুল পায় না। সেখানে ঐ চলা—অন্ধ আবেগে এগোনটুকুই সত্যি ও সার্থক। তাই বলছি আমরা চোখ মুদে এগোলেও এই অনন্ত আকাশ ভরে ধ্রুব চক্ষু চেয়ে আছে সেই যা' ভরসা। তারপর পাকা মাঝির দেখা পাবই পাব, দিক আলো করে সূর্য্য একদিন পাটে উঠবেই উঠবে।
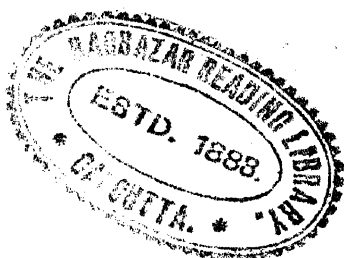
চারণের গান

এ দেশে চাই সেই চারণ—সেই কবি, যারা ভারতের গান নতুন করে গাইতে পারে; যাদের আঙ্গুলের স্পর্শে বীণার তারে তারে সেই সুর ওঠে যাতে এই অধীর আত্মবিস্মৃত জাতির স্মৃতির ফলকে তুষার ধবল হিমাচলের আনন্দস্থির মহিমা আবার স্বর্ণোজ্জ্বল শোভায় ফুটিয়ে দেয়। যে গানে আছে গঙ্গার পবিত্রতা, যমুনার নীল গভীরতা, নর্ম্মদার আনন্দকলধ্বনি, সিন্ধু-শতদ্রু-গোদাবরীর বীরগাথা। যে গানে আছে ঋষির সত্যলোক, রমণীর জহর ব্রত, হলদিঘাটের কৃপাণ, গৌড়েশ্বরের রাজ-মুকুট। যে গানে ভারতের শিব মৃতা দেশ-সতীর শব স্কন্ধে নিয়ে ধ্বংসের তালে নাচে, যে গানে ভারতের ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নাভি-হ্রদে সৃষ্টির বিচিত্র কমল ফোটে; যে গানে মায়ের দশ কমলকরের বরাভয়, যে গান আমাদের কালনিশার গায়ে জননীর রণ-বিলাসী খড়্গের বিজুরীজ্যোতি।

সেই চারণের চাই নয়নে অনন্ত জ্ঞান, কণ্ঠে অজস্র সুধা,

দেহে পাণ্ডবের দীপ্তি, বাহুতে ইন্দ্রের শক্তি, আর দিকপ্লাবী সুরে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন—নব উষার কাকলি। ঋষি যখন বীণা ধরে, দিব্য জ্যোতির অখণ্ড মণ্ডল যখন মানুষ হয়, চির-আনন্দ যখন বাণীময়, তখনই ভারতের চারণ ভারতে আসে। মানুষের মস্তক যখন সত্যের বৈকুণ্ঠে, বাহু যখন দেবতার বজ্রে, চক্ষু যখন ত্রিকালে, পদযুগ যখন তিন ভুবনে, তখন ভারতের চারণ ভারতে আসে। এই চারণ তার কমণ্ডলুর সঞ্জীবন জল নিয়ে, তার গঙ্গাবতারিণী শঙ্খধ্বনি নিয়ে, তার মধুঋতুদায়ী পদস্পর্শ নিয়ে যেখানে যেখানে আসে সেই সেইখানে ভারতের দেবতা প্রাণ পায়। তোমার ধর্ম্মে, তোমার সাহিত্যকলায়, তোমার বীর্ষে রাজপাটে, তোমার শিক্ষায় দীক্ষায়, সমাজে তপস্তায় এই চারণ চাই।

তুমি আজ জগতে দীন ও নিঃস্ব বলেই পরের দ্রব্যের বিলাসী, তুমি আজ জগতে মূর্খ বলেই পরের শিক্ষায় শিক্ষিত, তুমি আজ জগতে রাজশ্রী-হারা বলেই পরের রাজনীতির নকলনবিশ, তুমি আজ জগতে অশান্ত অধীর বলেই জীবনের অমৃতভাণ্ড খুইয়েছ। আবার এ মরা গাঙে জীবন-গঙ্গার পূর্ণ প্রবাহ ফেরাতে হলে সে অমর স্মৃতি জাগাতে হবে, তবে জনে জনের জীবন-পাটে প্রবুদ্ধ ভারত আবার আপন মহি-মায় উদয় হবে।

সেই চারণ এসে আর একবার ভারতের ধারা ভারতকে শেখাবে। সে এসে আর একবার ভগবানের ভিক্ষার রীতি মানুষকে শোনাবে। সে এসে আর একবার পাঞ্চজন্য-নিনাদের মত তেমনি স্বরে ডাক দিয়ে বলবে, "নারায়ণ যখন ভিক্ষায় আসেন তখন ক্ষুদ্র বানররূপেই আসেন, বামন বলে কিন্তু তাকে তুচ্ছ ভেবো না। নারায়ণ যখন নিজে বিশ্বপতি হয়েও ভিক্ষার জন্য কমল হস্ত এগিয়ে দেন, তখন তাঁর তিন পায়ে তিনি ত্রিলোক চেপে দর্পহারীর হাসি হাসেন, আর মুখে বলেন "আর কি আছে তোর? দে আমায়।" শক্তিমানের চাওয়া এমনি চাওয়া; নিতে যার কিছু বাকি নেই, দিতে যার অন্তর-দেউলের কুবের-ভাণ্ডার খোলা, এদেশে শুধু সেই জগজ্জয়ী ভিখারী। এ দেশের শিব আপন অন্নপূর্ণার কাছেই ভিখারী। পরের দুয়ারের যাচক ভারতের মানুষ নয়। আত্ম-প্রবুদ্ধ জাতিই বিগ্রহধারী নারায়ণ, সেইখানেই অপার শক্তির দেবতা অবলীলায় জগজ্জয়ী, ভ্রূভঙ্গে সৃষ্টির ঠাকুর। কেবল সেইখানেই পার্থসারথী নরনারায়ণ নিরস্ত্র তবু সে কিন্তু কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে কুরুবিজয়ী। এ দেশে অর্জুন চিরদিনই সশস্ত্র, কেবল শ্রীকৃষ্ণই নিরস্ত্র।"

মানুষের ডাক

মানুষ ভাবে কাজ কেন হয় না। এত মানুষ আছে, তাদের প্রাণে ইচ্ছে আছে, মুখে মুখে উত্তেজনার লহর ফুটছে, যার তার কথায় হাজার হাজার মানুষ যেখানে সেখানে বলবামাত্র লাফিয়ে পড়ছে, তবু কাজ এগোয় না কেন?

এ কথার ঐ উত্তরে একই কথা বলতে হয় আসল মানুষ নেই। আমরা নিঃসম্বলে পথ চলেছি, এ পথের পুঁজি যে মনুষ্যত্ব তা আমাদের হারিয়ে গেছে। ইঙ্গিতে ছোটবার ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ ঢের আছে, ইঙ্গিত দেবার দিশারী মানুষ নেই। হুকুমে চুণ বালি বইবার মুটের দল হাজার হাজার পাবে, ইন্দ্রপ্রস্থ গড়বার শিল্পী নেই। বড় বড় বুলির ফানুষ উড়িয়ে রাজপথ মুখর করে চলবার মানুষ ঢের আছে, সত্যসংকল্প সত্যদর্শী সত্যসাধক ঋষি নেই।

একদিন ছিল, রত্ন-গর্ভা ভারত জননীর পেটে তখন বীর জন্মাত, শিল্পী জন্মাত, মুনি ঋষি কর্ম্মী জন্মাত, স্বয়ং ভগবানেরও সাধ হ'ত মনুষ্য দেহ ধরে ঐ মায়ের জঠরে এক-

বার জন্মাই। তাই তখনকার যুগে তাদের হাতে যা' গড়ে উঠত তা' ভাঙতে লাগত হাজার পাঁচ হাজার বছর। যে অনুপম সৃষ্টির টুকরো টাকরা গোপুর মন্দির জয়স্তম্ভ যে যেখানে আজও পড়ে আছে সেই সেই স্থান আজকের মরা যুগের তীর্থ হয়ে রয়েছে।

দেশ মানে শুধু মাটি ত নয়, দেশ মানে বিশ্ব-চৈতন্যের একটি নূতন ঈষণা, নূতন ভঙ্গী, নূতন রূপান্তর ; মহামানবের নাভিকমলে আবার এক অভিনব সৃষ্টি—নব পদ্মের বিকাশ!—তাই না দেশ! দেশ মানে নব রাজপাট, নব শিল্পকলা, নব চাতুর্ব্বর্ণ্য, ঋষির নূতন সাধনা, বীরের নূতন দেবত্ব, নারীর নূতন লাবণী, বিশ্বকর্ম্মার নূতন স্বপ্ন। তা' তো আরমুখের ভুয়া কথায় গড়ে না, তিলোত্তমার রূপের মত তিল তিল করে লক্ষ স্রষ্টায় মিলে সৃষ্টি করলে দেশ-মাতার যে রাজীবশ্রী কমলা মূর্ত্তির উদয় হয় তা' তো শূন্যগর্ভ বাক্যে গড়ে না। অথচ

'দিন দুই ছুটোছুটি
দিন দুই হুটোপাটি
তারপর ফিরে আসে
হয়ে আধমরা,
আমাদের দেশ শুধু
বকাবকি ভরা।'

যত দিন আমরা দলে দলে কথা শুনে বেড়াব, যতদিন আমরা মালা গেঁথে নিয়ে হাততালির মানুষ খুঁজব, ততদিন কর্ম্মীর নীরব সাধনার দিন পেছিয়েই যাবে। যে বাজারে কথার এত দাম, সে বাগবাজারে কাজের কাজী তার পসরা নামাতে আসে না।

এখন মানুষ চাই, নীরব মিতভাষী মানুষ চাই, অক্লান্ত-কর্ম্মা নিরভিমানী মানুষ চাই, স্থিতধী লক্ষ্যভেদী মানুষ চাই, সত্যের ঋষি সত্যের অনন্যমনা সাধক মানুষ চাই, অটুট সত্যসংকল্প অসাম ধৈর্য্যশীল মানুষ চাই। যারা জীবন-জলে কালী বলে একেবারে ডুব দিতে জানে, যারা বাজারে হাততালির জন্যে কখনও ছুটে আসবে না কিন্তু নীরবে গড়বে, যারা পরের ছেঁদো কথায় শক্তিক্ষয় করবে না কিন্তু মায়ের রাজসিংহাসনের এক একটি সোনার খুরো ধরবে আর গড়ে ছেড়ে দেবে। যে যেদিকে যাবে তার তাই-ই হবে একান্ত সাধনা, সেই দিকেরই সত্য সে গভীর ধ্যানে উদ্ধার করবে আর জীবনে সফল সাধনে ফলিয়ে দেখিয়ে দেবে যে তা' হয়, তা' এই চার পোখা মানুষেরই সাধ্য।

এদেশে আগে নির্ম্মাতা চাই,—কৃষির ঋষি চাই, শিল্পের ঋষি চাই, কলার ঋষি চাই, ধর্ম্মের ঋষি চাই, শক্তির সাধক চাই, জ্ঞানের সাধক চাই; কারণ সবই যখন ভেঙে শ্মশান

হয়ে গেছে, তখন মরার দেহে জীবন সঞ্চার করতে—ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলতে সাধন-গঙ্গা—যার জীবন শিবের জটা বেয়ে নামতে পারে এমন অপরূপ মানুষ চারি দিকে প্রতি ক্ষেত্রে চাই-ই চাই।

এমন মানুষ এক একটা এলে যুগ পাল্টে যায়, ভানুমতীর ঝোলায় তখন যে সম্পদের নাম করে হাত দাও তাই উঠে আসে। একটা অরবিন্দ দেবকীর বুকের পাষাণ আঙুলের ভরে টলিয়ে দেয়, একটা গান্ধীর বিফল স্বপ্নে অকালেও বসন্ত দেখা দেয়। শিব-অংশের বিষ্ণু-অংশের এই সব মানুষ প্রলয় জলে বিলুপ্ত জীবন-বেদের উদ্ধারী। কিন্তু সে বেদ শুধু উদ্ধার করলেই হবে না, তার প্রতিটি সত্য হাজার সাধকে সেধে নিতে হবে, ফলিয়ে দিতে হবে, ঋষির স্বপ্ন সফল করতে হবে। তাই আজ মানুষের ডাক পড়েছে; তাই আজ মানুষের মাঝে দেবতার খোঁজ হয়েছে; তাই আজ আর দু' চোখে কুলোয় না, কপালের তৃতীয় জ্ঞান-নেত্র খোলবার দিন এসেছে। তাই বলি, তোমরা কে কোথায় আছ, এস, শিবের ত্রিশূল কে ধরতে পার এস, দিগম্বরের শিঙা কে বাজাতে পার এস, কালীর খড়্গের বিজলী ও বরাভয়ের শরণ কে একসঙ্গে জাগাতে পার এস। দুইভুজ নিয়ে কে অষ্টভুজা সাজতে পার এস, দুই চক্ষে কে ত্রিনয়নের

মানুষ গড়া

জ্ঞান-অগ্নি জ্বালতে পার এস, পুষ্পশয্যা ভুলে পশুরাজ সিংহের পিঠে চড়তে পার এস, জগতের অসুর হাসি-মুখে কে দলতে পার এস। তাই বলি মানুষ চাই। আর কিছু চাই নে, শুধু মানুষের মত মানুষ চাই। সেই মানুষ এলেই ভানুমতীর ঝোলা থেকে চতুর্দ্দশ ভুবন বেরিয়ে আস্‌বে।

সুন্দরের পূজা

মানুষের পনর আনা আছে মানুষের ভেতরে, তার সত্তার শক্তি ও জ্ঞান মাত্র এক আনা বাইরে প্রকাশ হয়েছে। অন্তরের এই গোপন রত্নাকরে যখনই মানুষ ডুব দেয়, তখনই দু'হাত ভরে রত্ন মুক্তা তুলে আনে আর দুনিয়ায় রূপের আনন্দের বাহার খুলে যায়। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখ, এই রকম ডুবুরী মানুষের যুগই আলোর যুগ, জ্ঞান গরিমার যুগ, সৃষ্টির যুগ। এক একটি যুগ-উষা রক্ত তপনের মত এমনি এক একটি সপ্রকাশ মানুষ—আপনাকে যে কুড়িয়ে পেয়েছে, এমন মানুষ মুখে করে আসে আর তার ছোঁয়ায় ডুবুরীর ভিড় লেগে যায়। আর বাকি আঁধার দিনগুলো সফরীর দিন, সারা ইতিহাস ভরে তখন আলো নিভে গেছে, সর্ব্বত্রই কেবল সফরী ফরফরায়তে।

পরম সুন্দরের পূজা মানুষের গোপন স্বর্গের সোণা সিঁড়ির পৈঠা, ঐ পৈঠা বেয়ে তাকে আপন সুরপুরে উঠতে হয়। জগতে একদিন মানুষ প্রায় সব দেশেই সুন্দরকে

চিনত, জীবনের খুঁটি নাটি সব কিছুই নিখুঁৎ করে পরম সুন্দর করে গড়ত, তখন ছিল কলার যুগ, স্থপতির যুগ, কবির যুগ, ঋষির যুগ। তখন ভারত চীন জাপান মিশর য়ুরোপে বিস্তর ধ্যানের মানুষ ছিল, তাই মাটি খুঁড়ে আগেকার যা কিছু পাওয়া যায় তার রূপের ও মাধুরীর সীমা নাই।

এখন ত্নুনিয়ায় একমাত্র কলাবিৎজাতি হ'ল জাপান। আর সব জায়গায় সব দেশে চিত্রকর আছে বটে, স্থপতি আছে বটে, ব্যক্তিগত জীবনে তু'চার জন কলাজ্ঞান রেখেছে বটে, কিন্তু সমগ্র জাতি তা' হারিয়েছে। জাপানে যা' দেখবে তাই সুন্দর, সামান্য দাঁত কাঠির বাক্সটি পর্য্যন্ত কারুকাজে অনুপম করে তৈয়িরী। জাপানে সামান্য চাষা কুঁড়ে বাঁধে তাও প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে মিশ খাইয়ে, জাতির বুকের জাগ্রত কলাপ্রাণ তাকে কি অজ্ঞানে কি সজ্ঞানে সুন্দরের পূজা অহরহই করিয়ে নেয়। জাপানের আর্ট খুব উঁচু থাকের আর্ট না হ'লেও জাতির সম্বিতে তা চারিয়ে আছে, তাই তা, সত্য সত্যই জাতীয় আর্ট।

য়ুরোপ মধ্য যুগ অবধি তার art sense বা কলা জ্ঞান কতকটা রেখেছিল, তখনকার ব্যারণের প্রমোদ ভবন বা manor দেখ গে, সামান্য মানুষের বাড়ীখানির গঠন-

সৌষ্ঠব দেখ গে, দেখবে সেখানে মানুষ তখন ও সুন্দরের —সত্য সুন্দরের উপাসক। তার পর ঝড়ের মত এল বৈশ্যের যুগ, শূদ্রের যুগ, আর সব গেল হারিয়ে। অন্তরের ডুবুরী মনে ভেসে উঠল, মনের মানুষ প্রাণের ক্ষুধায় বড় বড় রেল পুল কারখানা ইমারত গড়তে লেগে গেল; গণতন্ত্র মানে দাঁড়াল মানুষের এক মুঠি চাল আর দু'টো ছেঁড়া কাঁথা।

তাই Doctor Frank Crane লিখেছেন, Kings & aristocracies are not imposed upon the people; they are supported by the people, they are an outgrowth of the peoples, belief that a human being ought to be a glorious thing, just as a Cathedral is an expression of the inextinguishable belief that a human being ought to be a devine & eternal thing.

Royalty is the pathetic effort of humanity to express that grandeur and largeness of life which it feels itself capable of.

The Kings and nobles we actually pro-

duce are poor specimen, but conviction that bred them is rich and noble.

Here is the poor humanity's experiment in glory by way of monarchy.

I wonder what short of glorious handicraft democracy will produce, Will it be only huge Ford Motor Works and Equitable Iusurance Buildings ?"

"রাজা আর অভিজাত বংশ মানুষের উপর কেউ কখন চাপিয়ে দেয় নি। রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণী মানুষেরই সৃষ্টি, তাদের দ্বারাই তা' গঠিত ও পুষ্ট হয়। মানুষ আপন অন্তরের দেবত্ব ও অমরত্বের নিদর্শন রূপে যেমন কারুকার্য্যময় অনুপম মন্দির গড়ে তেমনি নিজ মহত্বের বহিঃ স্ফূর্ত্তি রূপে রাজতন্ত্র ও অভিজাত তন্ত্রের সৃষ্টি করে।

মানবজাতি অন্তরে অন্তরে নিজের যে মহত্ব ও বৃহত্বের ভাব অনুভব করে তাই প্রকাশ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় রাজার সৃষ্টি। আমাদের জীবনের আমরা যে রাজা গড়ি তা' তাদের মেকী রাজা হলেও তার মূলের সত্যটি খাঁটি ও উঁচু জিনিস। এই তো গেল রাজা সাজিয়ে মানুষের মহত্বের সঙবাজী। কিন্তু ভাবছি আমি এই যে, এবার গণতন্ত্রের সঙটা কেমন

দাঁড়াবে। বড় বড় অজাগরী ফোর্ড মটর কোম্পানী আর ইন্সিয়োর‍্যান্স ইমারতেই তা' শেষ হবে না তো?

ডাক্তার ক্রেনের ভয় বড় মিছে নয়। "ডুব দেরে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে", এই ডুব দেবার মানুষ হাজারে হাজারে না এলে মানুষকে বড় করবে কে? অসীম ধৈর্য্যের শান্ত মানুষ—এই পরম সুন্দরের লক্ষ পূজারী না এলে অতল রত্নাকর থেকে এত রত্ন তুলবে কে? ,রত্নাকর শূন্য নয় কখন, যদি দু চার ডুবে ধন না মিলে?' একথা যে সফরীর জাতি বোঝে না। তারা ভাসা জলের মাছ, শ্যাওলা খায়, মাছি পোকা ধরে বেড়ায় আর ওপরে ওপরেই ঘোরে।

জাগরন্মুখ ভারতে আবার চিত্রশিল্পী জন্মেছে, আবার কবি ও সাহিত্যের নানান মিস্ত্রী এসেছে। ঋষির যুগও বুঝি আসে আসে হয়েছে। ভারতকে তাই য়ুরোপের বৈশ্য ও শূদ্র যুগ ভুলতে হবে, নারায়ণের অঙ্গ থেকে শুদ্ধ করে জীবন্ত করে শক্তিপূত জ্ঞানোজ্জ্বল করে চার বর্ণ গড়তে হবে। তাই ভারতের আজ নারায়ণকে আগে চাই।

———

ষষ্ঠ পর্ব্ব

নর-নারায়ণ।
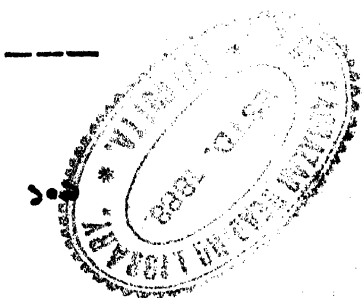
নরনারায়ণ

এই নতুন যুগের নতুন মন্ত্র হচ্ছে "ভগবান্ হও, ভগবান্ হও—realise, realise"; তাই মানুষের অন্তর বাহির আজ পূর্ণ প্রকাশের সাড়ায় এমন করে চেতন হয়ে উঠেছে। এবার চতুর্দ্দশ ভুবন আলো করা সোণার রঙের সূর্য্য বুঝি উঠবে, আদিত্য-বর্ণ সেই দিব্য পুরুষ ঘটে ঘটে বুঝি উদয় হবেন, তাই মহতী প্রেরণার রঙীন স্বপ্নে মনুষের হৃদয় মন প্রাণ উষায় উষায় উষাময়।

যারা কাজের পাগল তারা এ সত্য এখনও বোঝে নি, যারা হৃদয়ের স্নেহ মমতা ভক্তিরসের পাগল তারা নেশার জ্বালায় চোখ মুদেই চলেছে, যারা মন বুদ্ধির গভীর মানুষ তারা কর্ত্তা হবার সুখের লালসায় এ সত্যে এখনও সায় দেয় নি। অহঙ্কারে ভরা দীন মানুষ বড় লোভী, সে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েও লোভেই এত বড় দীন হয়ে রয়েছে। আপন অন্তরে যেখানে সে সত্য সত্যই অখণ্ড রূপে ভগবান —সেখানে সে যেতে চায় না, বাহিরের ছোট মন ও প্রাণের দোকানদারী—এই দু'পয়সার মোড়লী তার বড়ই প্রিয়।

তাই যখন মানুষের আধার কতকটা শুদ্ধ হবার পর উপরের আনন্দ ও শক্তির দুয়ার খুলে মানুষ সাত্ত্বিক ধনে ধনী হয় তখনও অহঙ্কারের লোভে তাকে পুরো দিব্য-জীবন পেতে দেয় না। সে তখনও চায় ভগবানের চাপরাস পেয়ে ভগবানের নামে রাজত্ব করবে, ভগবানের নায়েব হয়ে জমিদারী চালাবে। এই থেকে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, এই থেকেই মানুষের গুরু-গিরীর সঙ দেবার সাজার আরম্ভ। সত্ত্বের অহঙ্কারে অহঙ্কারী কর্ম্মী ভগবানকে মানে, কিন্তু চায় না। ভগবানকে চাইতে তার বড় ভয়, কারণ পাথরের স্তম্ভ ফেটে নৃসিংহ রূপে সে মহাশক্তি বেরুলে তার লোভের দুনিয়াদারী যে আর থাকে না ভগবান যদি নিজের আসনে ষড়ৈশ্বর্য্য নিয়ে বসে, তাহ'লে যে তাকে মরতে হয়, জীব নিবিড় নিষ্কামের ভরপুর শক্তিতে জুড়িয়ে যে স্বর্ণসিংহাসন রচনা করে, ভগবান যে তারি উপর রাজ-রাজ্যেশ্বর হয়ে বসেন।

আজ এই যে নতুন আলো নব ঊষার সূচনা করতে এসেছে তা' মানুষের এই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ নর-নারায়ণ বিগ্রহ গড়বে বলেই এসেছে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, ঘটে ঘটে আবার প্রতি ঘটে চক্র চক্রে ভগবান হয়ে যাবে। ভগবান আর মানুষ তো কখনই আলাদা দু'টো জিনিষ নয়, পূর্ণ নারায়ণই এই আধারে হয়েছেন অংশে জীব। এবার এমন

আলো চাই যা' সজ্ঞানে ইহজীবনে জ্ঞানের মানুষকে মূর্দ্ধায়—সেই আনন্দের শান্ত শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে। সে কাজ মানুষের অসাধ্য, তাই ভগবানের কাজ নির-বিগ্রহে স্বয়ং ভগবান জেগেই করে নেবেন। তোমায় আমায় শুধু আমাদের ভিতরের মন, প্রাণ ও দেহ এই তিন চক্র শীতল করে আনন্দ-রসে জুড়িয়ে সেই অন্তরের মহাপ্রকাশের স্বর্ণাসন সমস্ত স্বত্বা মেলে হত্তে হবে। যাঁরা এ নতুন উষার সুচনার বাণী বলতে এসেছিলেন তাঁরা অনেকে এখনও সঙ্ঘের পারমার্থিক গৃহিণীপনার লোভে অন্ধ, তাঁরা আজ জাগুন। শিব জাগছে তাই মানুষের সেই কোটী সূর্য্য সম্প্রকাশ জ্যোতি মণ্ডলের জ্যোতি হয়ে নিঃশেষে দেবসত্তা যাওয়া ছাড়া আর গতি নাই।
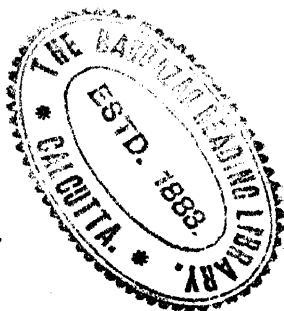
ত্যাগ না ভোগ?

নর কেন নারায়ণ? আর এই নারায়ণ বা কি? আমাদের বাহিরের এই দেহকে ঘিরে কতকগুলি ভাবনা চিন্তা, স্নেহ দয়াদি চিত্তের বৃত্তি ও কামনা ক্ষুধা অনবরত উঠছে, এই মন প্রাণ দেহাত্মক—খেলাকেই আমরা মোটা বুদ্ধিতে আমাদের "আমি" বলে জানি। এই তরঙ্গ—এই শক্তির খেলা আর এই স্থূল আধার দেহ যেখান থেকে এসেছে, সেই শক্তিময়কে দেখতে পেলেই পলকে সকল সত্য চক্ষের কাছে প্রতিভাত হয়। অহং জ্ঞানে ধরা এই দেহই সবখানি "তুমি" নয়, তুমি চোখের আড়ালের এক অচেনা মহাশক্তি, তোমারই সেই শক্তির এতটুকু স্ফুরণে ঢেউয়ের মত এই দেহের প্রকাশ, তোমারই অন্তর-নিগূঢ় পরম সত্তার এতটুকু মাত্র চেতনায় ছলে এই দেহ-রূপ ইঙ্গিত।

বাহিরের জগতের দিকে নত চক্ষে দেখলে কেবলই এই বিশ্ব-সূর্য্য বা অহংকারকে দেখা যায়। কিন্তু চক্ষু যদি উর্দ্ধতারক হয়, মন বুদ্ধি যদি একবার আপনার অন্তরে ফিরে চায়, তা হ'লে তখনই নর আপনাকে দেখতে পায়। উর্দ্ধে ভগবান

মহা সূর্য্য হয়ে লক্ষ কোটী জগত কুক্ষিগত করে চির উদিত রয়েছেন, আর জগতে যেন চন্দ্রমণ্ডল হয়ে সেই মহাভানুর সমস্ত জ্যোতি ধারণ করে আছে এই জীব। তাই ভগবানের সেই জীবভূতা পরা-প্রকৃতির স্থূল আয়তন হচ্ছে এই মানুষ।

দেহ প্রাণ মন বুদ্ধির পিছনে সকল চিন্তা কামনা ও কর্ম্মের মূলে সেই নারায়ণই বিরাজ করছে। আমরা সেইখান থেকে শক্তি পেয়ে চলি ফিরি খাই দাই ভাবনা চিন্তা সব করি, ভগবানের অনন্ত বিভূতিধারী সেই জীব-চন্দ্র এই দেহ মন প্রাণে জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ অবিশ্রাম গতিতে জুগিয়ে যায়। আর সে নিজে আনন্দ জ্ঞান ও শক্তি পায় নিজের পরম আশ্রয় ভগবান থেকে। আপনাকে প্রকাশ করবার জন্তই ভগবানের এই প্রকাশ-পাগল লীলা; তাই তো ভগবানের জীব-সৃষ্টি।

জীব গড়তে গড়তে—আনন্দ জ্ঞান ও শক্তি ভগবানের অঙ্গ থেকে আপন অঙ্গে ধরতে ধরতে যে আধারে অনন্ত তার পূর্ণ মহিমায় নামবে সেই আধারে নর নারায়ণ হবে। সমস্ত জগতে মানুষের সকল চেষ্টার পিছনে এই প্রেরণাই খেলছে, ভগবান যুগে যুগে সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে শনৈঃ শনৈঃ নামছেন। তিনি নামলেই তুমি আমি পূর্ণ, তা' হলেই এই জড় আধারেও তুমি আমি এই অসীম infinite at every point তখন সব খণ্ডতা সব দ্বন্দ্ব সব বিরোধ বেদনা

আনন্দের ছন্দে বেঁধে যাবে, তখন জীবনের সব ছোট সত্যও জীবন পাবে, সেই সর্ব্বাশ্রয় বৃহৎ সত্যে।

যদি এই ভাবে সমস্ত জীবন ভাগবত মুখে ফিরিয়ে নর নারায়ণ হয়, অন্তরে আনন্দ জ্ঞান ও শক্তির দুয়ার খুলতে খুলতে সে ঐশ্চর্য্য যদি অনাবরণ হ'য়ে খুলে যায় তখনই কেবল ত্যাগ ভোগের দ্বন্দ্ব ঘোচে—অনন্ত-ত্যাগী মানুষ অনন্ত ভোগের মধুর সামঞ্জস্যে স্থিত হয়। তার আগে আপনা-ভোলা অজ্ঞান মানুষ ত্যাগই করুক আর ভোগই করুক, দুই তার পায়ের শিকল। তোমার অনন্ত দেবতা ত্যাগের ঠাকুরও নয়, ভোগের ঠাকুরও নয়, সে সবার ঠাকুর অনন্তের দেবতা। সূর্য্য উঠলে যেমন সব মাণিক চকমক করে ওঠে, বড় সত্য—পূর্ণ সত্য জাগলে তেমনি সব ছোট সত্যই সার্থক হয়। ভোগ যদি তোমায় বাঁধে তা' হলে তোমার অন্তরের নারায়ণকে পাবে না, ত্যাগ যদি তোমার কাম্য হয়ে ওঠে তা' হলে'ও সে মুক্তির দেবতাকে পাবে না। আগে সর্ব্বস্ব ভগবানে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তার পর মধুর আনন্দে আনন্দঘন হয়ে সেই অঙ্গের অঙ্গ হয়ে তোমাতেই সেই সব সমর্পিত ধন ফিরে আসে। তখনই সেই নর-নারায়ণ সত্যকার ভোগী, কারণ অনন্ত ও বৃহৎ না হলে অনন্তকে যে ভোগ করা যায় না।

মানুষের কপালের ত্রিনেত্র।

ওগো মানুষ! তিন লোক চতুর্দ্দশ ভুবন তোমার মাঝে রয়েছে। তোমার যেখানটা থেকে বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র বেরোয়, সেখানটা না পারে কি? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে তারই ভ্রূভঙ্গে হয়! আজ পর্য্যন্ত যত শাস্ত্র রচেছে, যত বড় বড় রাজ্যপাট সুখ সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সব যে মানুষের অন্তর চুঁইয়ে বেরোন জ্ঞান, প্রেম আর কর্ম্মের ত্রিবেণী। মানুষ যে কি প্রলয় ব্যাপার, কি করে যে মানুষ বাইরে এতটুকু হয়েও অন্তরে ত্রিলোকব্যাপী, তা' ভুলে গিয়েই মানুষ আজ কাঙাল। মানুষ আজ স্বরূপ-ভোলা দীন-ভিখারী, নিজের বিশাল অন্তরের রাজপ্রাসাদ দ্যুলোক ভুলোক জন-লোক মহর্লোক তপোলোক সব ছেড়ে দিয়ে মানুষ আপনার সত্তার একটা ভাঙা বাইরের ঘরে বাস করছে। সেই ইট-জিরজিরে দেহরূপ বৈঠকখানায় বসে বসে তামস মানুষ মনে মনে রাজা উজীর মারছে, তাই ত এমন করে মানুষ আজ দুই কূল ক্ষুইয়েছে, তাইত সে এমন ভাবে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হয়েছে।

মানুষ গড়া

একদিন সুরাসুর মিলে দেবতা অসুরে মিলে সিন্ধু মন্থন করেছিল, তাই দেবতা খেয়েছিল অমৃত আর গরল উঠে বিশ্ব দাহ করতে না করতে দেবতার রাজা শিব তা' কণ্ঠে ধারণ করে দেব-অসুর সবাইকে বাঁচিয়ে ছিল। এখনও প্রতি সত্তার মাঝে মন্থন চলছে, অনন্ত লীলায় এ অনন্ত মন্থন ত কখনও থামে না! তবে পার্থক্যের মাঝে আজ সংসারে দেবতা নেই, কেবল মানুষ, আধা-মানুষ আর দৈত্য দানবের ভিড়। মানুষের মাঝে দেবতা নিদ্রিত। কাজেই 'অমৃতের ভাণ্ড হাতে লক্ষ্মী দশ দিক আলো করে আর ওঠে না। এখন কেবল বিষ আর বিষ! জগত চরাচর বিষে ভরে গেল, মানুষ যক্ষ রক্ষ সে বিষদাহে ত্রাহি ত্রাহি ডাকছে—কিন্তু তবু সেই গরল দাহই

"চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের
সন্দেহ তায় বিন্দু নাহি!"

দেহের জড়ভূমির পর প্রাণশক্তির রাজ্য—যে শক্তি এই দেহ-রথ চালায়। তার পেছনে মনের দেউড়ীর দুয়ার। সেও এক বিরাট বিশাল হৈম কিরটিণী লঙ্কাপুরী; তার পারে বুদ্ধির মহারাজ্য আছে। সেই বুদ্ধির রাজা হয়ে মানুষ এতকাল যা' কিছু বড় বড় সহর নগর কলকারখানা জ্ঞান বিজ্ঞান গড়েছে, সব তাতেই দুঃখ শুধু ফেনিয়ে উঠেছে। জীবনের

সাগর রক্তে রাঙা হয়ে কেবলি ফেনিয়ে ফেনিয়ে বিষ উগরেছে। সে বিষের হলকায়—শিবের ধ্যানভাঙা কপাল-নেত্রের আগুণে বিশ্ব আজ দাউ দাউ জ্বলছে। এখন এ অনল দাহ হতে জগতকে শান্তি দেবে কে? এ বিষ কণ্ঠে ধরে যে শিবের জাতি জগত রক্ষা করবে তাদের রাজ্য কোথায়?

দেহ প্রাণ মন বুদ্ধির পরপারে সেই রাজ্য সে জগত বিজ্ঞানের জগত। তামস এ জাতি রক্তনদী সন্তরণ করে রাজস জাতি হয়েছে, তার পর এসেছে স্বত্বগুণ অর্জ্জন করবার যুগ। ভারতের এই শুদ্ধির, আত্ম সংযমের ও তপশ্চর্য্যার সন্ধিক্ষণে দুই চার জন শক্তিমান পুরুষ যোগবলে অবাং মন-সগোচর সেই বিজ্ঞানের দ্বার খুলবে। উর্দ্ধের সেই মহাসত্যের জ্যোতিতে একে একে তাঁহাদের মন প্রাণ ও দেহ শুদ্ধ বৃহৎ ও উজ্জ্বল করে রূপান্তরিত করে নেবে। তখন তাদের মাঝে মানব জাতির জন্য কপালের এই ত্রিনেত্র খুলে যাবে, মানুষ দেবতা হবে, জীব শিবত্ব পাবে।

নবযুগের জীবন-সঙ্কেত।

এতদিন আমরা জগৎকে—এই সুখদুঃখময় সংসারের সব বস্তুকে ভগবত সাধনার বাধা বলে দেখে এসেছি। সাধকরা উপরে সেই জ্ঞানের ভূমিকায় উঠে দেখেছেন বটে যে, এ সবও ব্রহ্ম—তাঁরই তনু, তাঁরই বিভূতি। কিন্তু সাধন দিতে গিয়ে—সাধারণ মানুষকে বোঝাতে গিয়ে তাঁরাই মোটা দুনিয়ার নেমে এসে সংসারকে তিরস্কার করেছেন। বড় জোর বলেছেন, "সংসারে থেকেও সাধনা হবে না কেন, হয় বই কি ; বরঞ্চ কেল্লায় বসে লড়াই করাই সুবিধা। পাঁকাল মাছের মত পাঁকে থাকবে অথচ গায়ে পাঁক লাগাবে না।"

এটি খুব বড় কথা, কারণ আমাদের অন্তরে যে শিব আছেন তিনি সন্ন্যাসী, জগতের সম্বন্ধে উদাসীন, তিনি ঊর্দ্ধতারক মহাযোগী। যোগীর মুখে এ তাঁরই বাণী।

এতদিন তাই ধর্ম্ম ছিল মটকায়, ধর্ম্ম ছিল দুনিয়া ছেড়ে ওপরে উঠে গিয়ে ওপর থেকে নীচেটাকে কৃপার চোখে দেখায়, মানুষকে ওপর থেকে সূক্ষ্ম সুতায় বেঁধে মটকায় টেনে নেওয়ায়। এই জীব-তরাবার ধর্ম্মে বাছা বাছা মানুষ ঊর্দ্ধগামী সাধকের কৃপায় ও শক্তিতে তরে যেত, জীব জগত পড়ে থাকত সেই নীচের পাঁকে! বেদান্তের "সর্ব্বংখল্বিদং

ব্রহ্ম” সবই ব্রহ্মময়—এই বাণী ছিল সাধনার জিনিষ আর মটকা থেকে অনুভূতি করবার দৃষ্টি। সব বড় বড় শক্তিমান সাধকের এই উপরের দিকে চলার এই Star-gazing সংস্কারে এতদিন মানুষের আত্মা মুক্ত হয়েছে, দেহ মন প্রাণ রূপান্তরিত হয় নি। সাধনার লব্ধ অনন্ত জ্ঞান মাত্র অসাধারণ জন কতকের হয়েছে; তাও সমাধির মাঝে,—ডুবীয়ে। মণ প্রাণ দেহাত্মক—এই অপরা প্রকৃতি যেমন তেমনি মায়ার শাসনে রয়ে গেছে। ভগবান নররূপ ধরে আপন বিভূতিকে আপনি তিরস্কার করেছেন, নিজের সর্ব্বাতীত প্রপঞ্চোপশম মহান রূপকে বার বার দেখিয়ে দিয়ে সমস্ত মানুষকে এক রকম ঊর্দ্ধতারক করে দিয়েছেন। তারা তাঁকে ভাবতে গেলে স্বতঃই সংস্কারবশে ওপরে চায়, নিজের দিকে চায় না; ব্রহ্মপদে সটান পালাতে চেষ্টা করে, চারিদিকে এই জগন্ময় সর্ব্বাধার সদ্‌গতকে ফিরে দেখে না; যদি বা দেখে তো ঐ পালাতে পালাতে সভয়ে পথে দু'চার বার মাত্র চেয়ে দেখে, তারপরেই সরে পড়ে।

এই রকম ভাবের এতদিন দরকার ছিল, কারণ ঊর্দ্ধের জগতের প্রতিষ্ঠা মানুষের বুদ্ধিতে আগে করা চাই। সান্ত আধারের সান্ত মানুষের আগে বোঝা চাই যে সান্তকে ছেড়ে অনন্ত বলে একটা কিছু আছে। শ্রীচৈতন্য তুকারাম শ্রীরাম-

কৃষ্ণ আদি মহাপুরুষের জীবন ভাল করে বুঝে দেখ, দেখবে তাঁরা নিজেরা অহর্নিশি তাল তমালে জলে স্থলে কৃষ্ণ দেখছেন, সব নানা রূপ জীব জগৎ চিনির তৈয়ারী বলে সে রস আস্বাদনে ডুবে আছেন; কিন্তু জীবকে দেখাচ্ছেন আঙ্গুল দিয়ে উচু দিকে। ভগবানের মহা-লীলা, ভগবানের অনন্ত জ্ঞানের প্রকাশ বা পূর্ণতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন তাঁরা করেন নি।

এবার তাই উপরে উঠে সে পূর্ণ শিবত্ব নিয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ দেহরূপ সিঁড়ি দিয়ে তোমাদের জগতে নামতে হবে, নামতে নামতে যেমন যেমন সে পরশমণির পদক্ষেপ হবে তেমনি তেমনি সিড়ির ধাপগুলি সব স্বর্ণময় হয়ে যাবে। কয়েকটি শক্তিমান আধারে প্রথমে জীব জগতের রূপান্তর হতে হতে নবযুগের এ মহা বিভূতি জগৎ ছাইবে, তার প্রভাবে মানুষের মনের সান্তপট ভেদ হয়ে নীল অনন্ত দেখা দেবে, মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে সহজ জ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত যোগে তিন লোক জোড়া আপন স্বরূপ দেখা অখণ্ড বোধ নিয়ে সান্ত আধারে আনন্দের মূর্ত্ত ও সহজ কর্ম্মে এক নতুন দিব্য জীবনের সূত্রপাত হবে। সে জীবনে মন হবে নূতন—উপরের সত্যে বিধৃত উজ্জ্বল ও জ্ঞানময়, প্রাণ হবে শুদ্ধ তপঃ পূর্ণ, নিষ্কাম ও অজর অশোক এবং দেহ হবে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঋতময়।

নতুন সৃষ্টির বেতারা খবর !

একই শক্তি তিন রকম কাজ করে বলে তিন রঙা। যখন গড়ে তখন ব্রহ্মা, যখন রাখে তখন বিষ্ণু, আর যখন আবার নতুন করে গড়বার জন্য ভাঙে তখন শিব। এ দুনিয়ার মানুষও জন্মায় তিন রঙা শক্তি নিয়ে। নতুনের ডাকের মানুষ—সৃষ্টির মানুষ—তারা নিজের নিজের অন্তর জগতের সপ্তলোক ভেদ করে কেমন এক রকম বেতারা খবর পায়, যে,—এবার দুনিয়া, নতুন রঙে নতুন মাল মসলায় গড়তে হচ্ছে। মন প্রাণের দুই কাণ ভরে সে ব্রহ্মবাণী তাদের পাগল ও অতিষ্ঠ করে তোলে। তখন তাদের স্বর্গে ওঠবার সোণার সিঁড়ি রচবার পালা পড়ে যায়, কারণ কার যেন বাণী—

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া গো

আকুল করেছে মন প্রাণ,

চক্ষুর অগোচরে কবে কোন্ সুলগ্নে যার শুধু ডাকই মানুষকে এমন করে দেবতা করে দেয়, সেই ডাক নব সৃষ্টির মহাবীর্য্য নিয়ে তাদের মাঝে নামে।

তাই সে বেতারা খবর পেয়ে নবীনতার ব্রহ্মারূপী সৃষ্টিকারী মানুষ আপন মন-জগতে সোণার সিঁড়ি গড়ে গড়ে নিজের সপ্তলোক এক করে ফেলে; সেই অনন্তের মাঝে নিজেকে কুড়িয়ে পেয়ে তাঁর ভিতরটা হয়ে যায়—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

যেই আত্ম-জ্ঞান উদয়ে জীব শিবত্ব পায় অমনি অফুরন্ত শক্তি এ আধার ভরে সহস্র মুখে উৎসারিত হয়। তখন জগৎ রচনার যুগ পড়ে যায়। কিন্তু মানুষের এ মোটা মন-বুদ্ধির মোটবাহী আধারটা সে শক্তি ধারণ করতে পারে না, নেশায় পাগল হয়ে গিয়ে অনেক কাণ্ড করে বসে। তাই চাই সে আধারে অটল সমতা, যে মানুষ ধৈর্য্যের অবতার— কিছুতেই টলে না, সেই কেবল নিজের হৃদয়-পদ্ম খুলে উর্দ্ধের পরম আলো মেলে ধরে শান্ত শোভায় জীবন-জলে দুলতে থাকে, তার মাঝে আলো ঝলকে ঝলকে আসে আর ভরে থাকে। এই রকম করে নিজের জ্যোতির স্পর্শে শক্তির ঝলক ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে পরম সত্ত্য নিজেই এই জড় আধার আপন লীলার উপযোগী করে নেয়। শান্ত সমাহিত সাধক যখন নিত্য জ্যোতি-মগ্ন হয়ে পরম সূর্য্যে পরিণত হয়, তখন তার ভ্রূভঙ্গে সৃষ্টি হয়; তার কাছে পরশ মাত্র পেয়ে শক্তি-পাগল মানুষ ছুটোছুটি করে, আর ভাবে, "এ সব ত

আমিই করছি।” তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হয় ডাইনামো আর বিবেকানন্দ নিবেদিতা তাই ছুঁয়ে জগতরচনার বেরয়।

তার পর রচনার যুগের পর রক্ষার যুগ আসে। তখন সব আরও ছোট ছোট আধার আসে সে অনুপম—নতুন দুনিয়াকে বাঁচাতে। তারা শক্তি আনন্দ বা জ্ঞানকে দেখতে পায় না, দুই চক্ষু ভরে দেখে—শুধু সেই শক্তির রচা বিরাট ইমারৎকে, আর পড়ে যায় তার মায়ায়। মমতায় অন্ধ হয়ে তাহা ভাবে, “আহা! এমন জিনিষটা একে যা' হোক করে রাখতেই হবে।” তখন তারা নিজের হৃদয়ের ভাব ঢেলে প্রাণের শক্তি বারি সিঞ্চনে মনের মণিমুক্তায় সে ইমারত ঝলমল করে তোলে। মায়া কিন্তু অন্ধ, তাই নবসৃষ্টির প্রেরণার অভাবে ক্রমশঃ নিজের অন্তরের শিবকে ঢেকে দীন হয়ে তারা সৃষ্টি করতে ভুলে যায়, শুধু যা' এতদিন সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ঠিক ঐ রকমটি রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় যে অনন্তের সৃষ্টি বহুরঙা,—তার গড়ারও বিরাম নেই, ভাঙারও বিরাম নেই; অনন্তকে ভেঙেও ফুরান যায় না, গড়েও শেষ করা যায় না—সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ময়ী সে শক্তি নিত্যই পূর্ণ, সে আনন্দ নিত্যই শক্তি-তরঙ্গ মুখর সাগর-জল, সে জ্ঞান অনন্ত আনন্দে নিত্যই সিসৃক্ষু—সৃষ্টি-পাগল।

———

ভাগবত জীবনের ভিত্তি

ভগবান চির-নূতন তাই চির-সুন্দর। প্রত্যেক বার যুগান্তর হয়ে গেলে মানুষের অন্তর ভরে এই চির-নূতনের ডাক আসে, সে আবার নূতন করে সুন্দর হতে সুন্দরতর হতে চায়, তাই জগত ভরে তখন সৃষ্টির সাড়া পড়ে যায়। আজ সেই রকম একটি মহাযুগান্তরের সন্ধিক্ষণ এসেছে, তাই মানুষের বুক জুড়ে ভগবানের উষা আজ সোণার আভায় মানুষের সকল অন্তর-ধাম আলো করেছে। এ সৃষ্টি আগে ধীর যে, শান্ত যে, নিষ্কাম যে তার অন্তরে নূতন জ্ঞানে নূতন সত্যে ফুটবে, তার দেহ, প্রাণ, মনের প্রতি অনুপরমাণুতে প্রতি ধারায়, প্রতি তরঙ্গে নূতন শক্তি খেলবে, মন বুদ্ধির উপরের আকাশ ফেটে নব আনন্দ অভিষেকে নবজ্ঞান সূর্য্যোদয়ের মানুষ নবরাজ-বেশ ধরবে; তার পর সেই সৃষ্টির প্রেরণা জাতি-মন, জাতি-প্রাণ ও জাতি-দেহ চঞ্চল করে বাহিরে রূপ নেবে। ভগবান মানুষে ও মানুষ বিশ্ব জগতে আপনাকে নূতন আনন্দে নূতন করে সৃজন করবে।

এখন শুধু গুটিকয়েক শুদ্ধ আধারে এই ভগবত শক্তি নামছে। এই কয়টি আধারে মনপ্রাণ ও দেহের অপরা প্রকৃতি বদলে পরা প্রকৃতির ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে তবে তা' একদিন হয়ত বিদ্যুৎ সঞ্চরণে ঘট হতে ঘটান্তরে সত্যের অমোঘ রাজ্য স্থাপনা করতে পারে। এই ভাগবত বোধনের দুটি ক্রম, প্রথম মানব জীবনকে যোগময় করা ও দ্বিতীয় সেই শুদ্ধ আধারে সপ্তধাম আলো করে একেবারে উর্দ্ধের সত্যে রূপান্তর করে ভগবানের জাগা। এতদিন জপ তপে সাধন ভজনে যোগে ধ্যানে মানুষ এই সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতেই এত জন্ম কাটিয়েছে ; কত সাধু মহাজন অবতার পুরুষ ভগবানের স্বর্ণ-জ্যোতি এনে এনে আধারে আধারে সঞ্চার করেছেন। তার ফলে এখন এই টুকু হয়েছে যে বঙ্গ জুড়ে ভারত জুড়ে অন্ততঃ প্রতি দশ সহস্র মানুষে একটি শুদ্ধ আধার আসে এবং আরও অমন দশ বিশটি মানুষ মহান প্রেরণা ও শক্তি নিয়ে জন্মে যোগময় জীবনের আশায় সাধনপর হয়।

ভগবান নামছেন। তাই এবার তাঁর শক্তি ধারণ করে অটল শান্ত যোগযুক্ত থাকতে পারে, এমন শত শত অহঙ্কারমুক্ত আধার চাই। যে যে হৃদয়ের গোপন মন্দিরে তাঁর শঙ্খ বেজেছে তাদের এখন শুদ্ধ হবার যুগ। তাই ডাক দিয়ে বলছি, যেখানে যে আছ জীবন যোগময় কর, অহঙ্কার থেকে

মুক্ত হও, সাধনায় শক্তিলাভ কর। তোমার দেহরথ স্থির করবার আপাততঃ তুমিই কর্ত্তা, কারণ ভগবান তো এখনও ও-ঘটে জাগেন নি, এখনও তো ভাগবতী শক্তি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ও-আধারে আধার গড়তে নামেন নি। এখন তোমার দেহ মনের ঘটে অহং রূপেই তার খেলা চলছে, এখনও রাজ্যে তোমার অহংজ্ঞানই তাঁর প্রতিভূ। তুমি রাজি হ'লে তবে না ভগবান এ অহঙ্কার সম্বরণ করে আপন ভাগবত সত্তা প্রকাশ করবেন। কিন্তু প্রতি পদে পদে ভগবান অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেন কখন সাধক তাঁকে চায়, কখন আসন থেকে উঠে তাঁকে তার নিজের আসন ছেড়ে দেয়, কখন আপন হাতের খড়্গ ও মুখের শঙ্খ তাঁর শ্রীহস্তে স্বেচ্ছায় তুলে দেয়। যেই তা মানুষ করে, অমনি তাঁর মুখে সে শঙ্খ বেজে উঠলে তাঁর হাতে মানুষের দেওয়া কৃপাণ নাচতে না নাচতে দ্বিভুজ মানুষ চতুর্ভুজা হয়ে যায়, তার হাতে নূতন অস্ত্র, মুখে নূতন শঙ্খ বিরাজ করে।

এই রূপান্তরের নাম সাধনা। এমন একটি নয়, দুইটি নয়, ক্রমে ক্রমে তিন ধামে তিনটি রূপান্তর পূর্ণ হ'লে মানুষ ভগবান হয়। প্রতি রূপান্তর মানুষের সম্মতি চাই তবে একটু একটু করে অহং গেলে, সেই ভূমিতে তিলে তিলে সাধকের সাধন নেত্র খোলে। প্রথমে তাই অনেক সাধককেও অহং দিয়েই সমর্পণের কাজ করতে হয়. সাধকের মধ্যে অহঙ্কার মন বুদ্ধি

প্রাণ দেহ এমনি যা' যা' যন্ত্রপাতি ও শক্তি সামর্থ আছে সব ভগবানের কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। এমনি করতে করতে এই সব পুরাতন যন্ত্র-পাতির সাহায্যেই ভগবান সাধকের অন্তরে নূতন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি গড়ে নেন, নূতন শক্তি নামিয়ে আনেন। যত শক্তি আসে ততই এ স্থূল অহংকার গলে যায় ও তার স্থানে ভগবানে অংশরূপী চৈত্য সত্তা—psychic soul জাগে।

সমতা মুখের কথা নয়, সমতাও বড় কঠিন ও দুর্লভ ধন। সমত্বং যোগ উচ্যত। এই সমই ব্রহ্মরূপ। কিন্তু সমত্ব অর্থে নিষ্ক্রিয় জড়তা নয়, প্রগাঢ় শান্তির মাঝে ভগবানের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি আনন্দের মাঝে একাঙ্গ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলায় বিরাজ করে এবং জীবসূর্য্য উন্মীলিত হয়ে তার সাথে যুক্ত থাকে তারই নাম সমতা। মানুষের অপরা রূপষ স্থহয় তার পরা রূপের হাতে। এবং যন্ত্রও শেষে ভগবানের শক্তিরূপে পর্য্যবসিত হয়, তারই নাম সমতা। প্রথমে একে একে মানুষের মন প্রাণ দেহ এই ত্রিলোক যোগসাংনে স্থির হয় তার পরে সেই স্থৈর্য্য বা শান্তি ভগবানের শক্তিতে ভরে যায় এবং শেষে তাঁর অনন্ত সহজ 'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি' জ্ঞানের স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় (luminous and truth conscious) উদয় হয়।

———

"আনন্দ নগরে যাহার বাস।
সে মানুষ এসে মিটিয়ে আশ।"

স্বাধীনতা স্বরাজ বা গণতন্ত্র কোন বিধান নয়, তা' হচ্ছে আসলে অন্তরের আলো, মনের ভাব বা আদর্শ। জাতির বুকআগে আসে মাঠের মত বিরাট বিশাল উদার সত্তা নিয়ে মানুষ, তার পর তার চলা বলা করার ভঙ্গিটা হয় বিধান। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর নেই, কারণ এই মানুষেই নারায়ণ-রূপ ধরে, এই সাড়ে তিন হাত বা চোদ্দ পোয়া মানুষের আধারে ভগবানের দিব্য ও নানা মিশ্র শক্তির ভেল্কি খেলে আর সেই সোণার কাঠি রূপার কাঠির ছোঁয়ায় যাদুকরের যাদুর মত সভ্যতা, সম্পদ. শ্রী, রাজপাট, ইতিহাস, শিল্পকলা কত কি পটপট করে গড়ে ওঠে। একটা বুদ্ধ এসে কি যেন কি পায়, নিজের অন্তর দলের সম্পুটে বাঁধা চতুর্দ্দশ ভুবনের সাড়া জাগিয়ে দেয়, শক্তি আনন্দ প্রেমের অচিন দুয়ার খুলে ধরে, আর অমনি কি জানি কেমন করে

চোখের পলকে একটা নূতন জাতি তার উপমাহারা ইতিহাস, জীবন বৈকুণ্ঠগঠনকারী বুদ্ধি নিয়ে নতুন সৃষ্টির নক্‌সা আঁকতে কিলবিল করে বেরিয়ে আসে।

তাই বলি মানুষই সব। কিন্তু যে মানুষ তোমরা চেন, এই নাক-চোখ-হাত-পা-ওয়ালা কাঠামোটা—এটা তো আর সব নয়, এটি শুধু কোন্ নিবিড় উধাও অনন্ত শক্তি-রাজ্যের বেতারা-বাক্স, সেই অচিন আনন্দপুরীর খবর নেয় দেয়, তার রাগিণী বাজায়, সেই ভুবন-ভাঙ্গা ভুবন-গড়া সুরে সুর বেঁধে দু'টো চারটে ছড়ির টানে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় লাগিয়ে দেয়। আমেরিকার ইতিহাস থেকে ওয়াশিংটন লিঙ্কনের মত মানুষগুলিকে তুলে নাও, মার্কিণ গণতন্ত্র অমনি ভুয়ো হয়ে যাবে, ওই সব মানুষের বিশাল বুকের রসে শেকড় গেড়ে এই মহারাজ্য গড়ে উঠেছে। আবার ফরাসী ইতিহাস থেকে বেছে বেছে কয়েকটি মানুষ তুলে নাও, সঙ্গে সঙ্গে এক একটি যুগ পুঁছে যাবে।

সপ্তম পর্ব।

নারীর দেবীত্ব।

নারীর পথ

নারীকে উঠতে হলে আগে চাই দেশজোড়া সাড়া, তাও বিশেষ করে নারীরই মাঝে। নারী যদি আপনি আপনার বন্ধনের, দীনতার ও পরবশতার দুঃখ ও পঙ্গুত্ব না বোঝে তা' হ'লে নারীকে তুলবে কে? হিমাচলকে কেউ নাড়তে পারে না, কারণ হিমাচলের নিজের গতিতো নেই-ই উপরন্তু প্রচণ্ড রকমের ভার আছে। বঙ্গের ও ভারতের নারী জাতি আজ মরে হয়েছে সেইরকম জড় হিমাচল, কার সাধ্য তাদের নাড়ায়। তার ওপর জড় পাহাড় শুধু জড়ের মতই পড়ে থাকে, তাকে নাড়াবার জন্য প্রযুক্ত কোন শক্তি সেই পাহাড়ের ভার যদি কখন একবার ঠেলে উঠতে পারে তা' হ'লে গিরিরাজ আর কোন ওজর আপত্তি বা প্রতিকূলতা করে না, সহজেই নড়ে যায়। কিন্তু নারী তো আর জড় পাথর নয়, সে মরণের পথেও জীবন্ত, তাই তার শুধু জাগবারই সাড়া নেই তা' নয়, সেই চিরাভ্যস্ত সহজ প্রবৃত্তির পথে মরবারও তার তাড়া আছে। সে বন্ধনকে আশ্রিতার পরবশ জীবনকে ও শুধু প্রাণ ও হৃদয়ের ক্ষুধা

তৃপ্তিকেই নারীত্ব বলে, সুখসাধন বলে, পূর্ণ সতী-আদর্শ বলে জড়িয়ে ধরেছে। সুতরাং যতদিন নারী নতুন মুক্তির আনন্দে নিজে সায় না দেবে, যতদিন তারা গতিকে ও নূতনত্বকে নির্ভয়ে জীবনের আঙিনায় প্রবেশ অধিকার না দেবে, ততদিন নারীকে পুরুষ কৃপার জোরে বা বাহির থেকে খোঁচা দিয়ে জাগাতে পারবে না। এ কথা অতি ধ্রুব সত্য, এ যাবৎ তাই এদেশে নারীজাগরণের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

নারীকে জাগতে হলে প্রথমে কয়েকটি পূর্ণ নারীত্বের আদর্শ বা মূর্ত্ত্য প্রতিমা চাই, যাদের দেখে নারীর জাগবার প্রেরণা হবে। সে প্রতিমা হবে জীবন্ত সবল মানবী দেহে, সে নারীত্ব হবে সকল অঙ্গে পূর্ণ, সকল ধামে উজ্জ্বল, সকল ভূষণে রাজশ্রী-মণ্ডিত। তবে তা' দেখে শত শত মরা নারী জীবন পাবে। শুধু নূতন হ'লেই হবে না, শুধু মুক্ত হলেই হবে না, নূতন জগতের সে নির্ম্মাত্রী প্রথম ঋষি-মাতাদের ঋষি-পত্নীদের দেহে মনে প্রাণে সমস্ত অন্তর ভরে সঞ্জীবনী শক্তি চাই, তারা চলে যাবে আর পদস্পর্শে পাষাণে ফুল ফুটবে, তারা মুখে সত্যের শঙ্খ তুলে বাজাবে আর স্বর্গ ফেটে পতিততারিণী নেমে আসবে, তারা দর্শনে স্পর্শনে আলাপে সাহচর্য্যে শত শত আধার ভরে অমৃত ঢেলে দেবে।

এমন গুণের মানুষ—এমন অমৃতের পুত্রী কি করে হয়?

যে সে রহস্য জান সেই কেবল মুখে বোলো ভারতে নারীকে বাঁচাবার কথা। এ দেশের নারী যদি ভারতের দেশ লক্ষ্মী হয়ে না বাঁচল তা' হলে আর নারীর বেঁচে কাজ কি? শিক্ষিতা স্বাধীনা মেয়ে পাশ্চাত্যে কি কম আছে? পণপ্রথা রদ করে সহজে স্বামী পাওয়ায়ই কি নারী জীবনের সুখের পরাকাষ্ঠা? স্বামীর কোলে নিছক সোহাগের জীবনেই কি নারীকে কম পঙ্গু করে রাখে? রাজনীতির ভোটের অধিকারিণী হলেই কি তোমাদের দেশের উমা, দুর্গা, সরস্বতীর দেবীত্ব নারীর অঙ্গে ফোটে? অবশ্য ও সবেও নারীর অধিকার নারীকে দিতে হবে, কিন্তু সবার আগে দাও— তাকে শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম; নারী তার পূর্ণ জীবনের অখণ্ড সত্য আর একবার ফিরে পাক।

এই অখণ্ড সত্য কি? পুরুষ আজ আপন জীবনে তা খুঁজছে, নারীও নারীর পূর্ণতা খুঁজুক। এই খোঁজাই যে তার সাধনা। নারী শুধুই নারীত্ব নিয়ে আগে গড়ে উঠুক পুরুষ তার পৌরুষ নিয়ে গড়ে উঠুক, এইভাবে আপন আপন চরিতার্থতা খুঁজে পেলে তবে তো নারীকে পেয়ে পুরুষ পূর্ণ হবে, পুরুষকে পেয়ে নারী পূর্ণ হবে। অবশ্য একথা সত্য, যে, জীবনের পূর্ণতা কি নারীতে আর কি পুরুষে দু'চার জনের আদর্শ। সংসারে সবাই কিছু দেবতা

হ'তে আসে নি, সকল নারীর দেহমন প্রাণে যে উপাদান সে সামর্থ্য নাই, সকলের সত্তায় সে জলও উর্দ্ধমুখী ডাক বা প্রেরণা বিধাতা দেন নাই। তাঁর এ বিচিত্র জগতে নানা থাকের মানুষ এসেছে, তারা অধিকাংশই সংসারের হাসি-কান্নার সুখদুঃখের মানুষ এক কথায় তারা সবাই মানবীর থাক। সে মানবীর মাঝেও আবার আছে হাজার শ্রেণী হাজার গোত্র, উচ্চ নীচও মিশ্র আধারের হাজার রকমের। কিন্তু তবু এক হিসাবে তাদের সকলেরই লক্ষ্য এই উচ্চচূড় আদর্শ,নারীর এই পূর্ণতা, এই দেবীত্ব। তাদের নানা থাকের জীবনগুলি সেই উত্তুঙ্গ শিখরে উঠবার পৈঁঠামাত্র, থাকে থাকে শ্রেণী বিন্যস্ত হয়ে তারা রচনা করে আছে নারী জীবনের কৈলাশ সিখরের সিঁড়ি। গার্গী মৈত্রেয়ী দু'চার জন হয় বটে, কিন্তু জগতের সমস্ত নারীর স্বীকৃতিতেও চেষ্টায়ই দু'চার জনে সে পরম সত্য সফল হয়ে সমস্ত নারী সমাজকে মহীয়ান করে।

উপরে পুরুষ প্রকৃতি, শিব পার্ব্বতী, আর নীচে তারই ছোট বড় পূর্ণ অপূর্ণ ছবি। নারী আমার কেবল মাতা পত্নী নয়, সখী নয়, সহধর্ম্মিণী নয়, নারী আমার আরও অনেক বেশী। যে অফুরন্ত অমৃতের মাঝে আমি পূর্ণ, নারীকেও আমি সেই অমৃতে না পেলে আমার নারী পাওয়ার সাধ মেটে না। রূপে মানুষের ক্ষুধা আজও মেটে

নাই, গুণেও সে তৃষ্ণা মেটে নাই, তাই কামনাতাড়িত মানুষ অন্তরে অনন্ত ক্ষুধার তাড়নায় বহু নারীতে আসক্ত হয়, এক নারীরই আধারে যে তাকে অনন্ত করে অফুরন্ত করে পাওয়া যায় তা' কামনাব্যাকুল মানুষ জানে না বলেই নারী এমন পঙ্গু হয়ে আছে। এ কথা না বুঝলে নারীর জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা আসবে না, ভারতে দেবীত্বের প্রতিষ্ঠা হবে না। নারীর শুধু দেহ কতটুকু? তার প্রাণ স্পর্শে আমায় আনন্দ দেবার ছলে ক্ষুদ্রের মাঝে এনে আমাকে যে বেঁধে ফেলে! এ জগতে সবই আনন্দ দেয়, কিন্তু একটা কিছুকেই ঐকান্তিক করে নিলে তাই আবার বন্ধন ও মরণের ঘর হয়ে দাঁড়ায়। এই সত্য মানুষকে আগে শিখতে হবে, যে, নারী শুধু কামিনী নয়, স্নেহ অন্ধ মাতা নয়, সেবার দাসী নয়, তবেই এদেশে মেয়ে ক্ষুদ্র তার মৃত্যু থেকে বাঁচবে ও বৃহৎ জীবনে নব জন্মের অধিকারিণী হবে। এদেশ নারীকে শুধু কামসুখের কামিনীরূপে নিয়ে ডুবেছে, পুরুষের তাই পৌরুষ গেছে ধর্ম্ম গেছে, দেশ গেছে, মান সম্ভ্রম গেছে, সব খুইয়ে জীবন এসে দাঁড়িয়েছে পত্নীর শয্যায়, প্রেমিকার স্বপ্নে, প্রেমের নামে কামের অভিনয়ে। এত অপমান সয়ে নারী মরবে না তো মরবে আর কোন বিবে?

নারীর জীবন-সত্য

আমি নারীর কথা যখন বলি তখনই নারীর পূর্ণ রূপের কথাই বলি, যেখানে নারী একাধারে বিদ্যায় সরস্বতী, ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্মী, শক্তিতে অষ্টভুজা আর মহিমায় জগদ্ধাত্রী। দেশ বলতে—বঙ্গলক্ষ্মী বলতে যা' বুঝি আর ভারতের নারী বলতে যা' বুঝি তা' একই, একই ছবি ছোট করে আঁকা আর বড় করে আঁকা। আমাদের ঘরের মেয়ে দেশ-আত্মার শক্তিরই প্রতিমা—অবশ্য যদি সে তা' হতে পারে। তোমরা ক্ষুদ্র মেয়ের কথা বলবে, তার সুখ, দুঃখ, বাঁধন, বেদনা, তার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দায়িত্ব অধিকারের কথা বলবে—তা' বলবে বল, কিন্তু ক্ষুদ্র কাউকে কখন বড় করতে পারে না। কি নারী কি পুরুষ যে ক্ষুদ্র, সে কত কিছুর কাঙাল বলেই ত ক্ষুদ্র! এ দেশের কোটি কোটি অসাড় পঙ্গু মূক ক্ষুদ্র মেয়ের এই যে জাতি—এই পাষাণময়ী অহল্যা, একে জীবন দেবে কে? ক্ষুদ্র কি তা দিতে পারে? তোমার আমার মুখে শাঁখ বাজলে কি স্বর্গের গঙ্গা মর্ত্ত্যে নামে? তোমার আমার ক্ষুদ্র বাহুর আলোড়নে কি এত বড় সাগর তেমন করে

মন্থন করা চক্রে যাতে সুধাভাণ্ড হাতে আপনি ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্মী উঠে আসে? যে কাজ বাঙলায় মাতাজী তপস্বিনী, নিবেদিতা করে গেছেন, তা, কি সাধারণ মেয়ে পারে? অথচ করবার কাজ যে তারও লক্ষগুণ বেশি।

ভারতের নারীকে বাঁচান যে জগতের পাষাণীকে জীবন দেওয়া! ধূমকেতুতে বিরজা সুন্দরী সত্যিই বলেছেন, "য়ুরোপের মুক্তা নারীও আজ সুখী নয়, সে কামনার ঝড়ের মুখে তৃণ মাত্র। ভারতের নারী বন্ধনের দুঃখে দুঃখিনী আর পাশ্চাত্যের নারী অসংযমের পঙ্কে মলীনা। কারণ শুধু বাইরের স্বাধীনতায় মানুষকে মুক্ত, সত্য, সুন্দর করতে পারে না।" সমাজের দাসী আর কামনার দাসী কে বেশী অকল্যাণের রূপ বলা বড় কঠিন। কি নারী, কি পুরুষ, মানুষকে তুলতে হ'লে প্রাণমনচিত্ত মাতানো বড় আদর্শ দেখাতে হয়, উঁচু থেকে ডাক দিতে হয়, স্বর্গের স্বর্ণ-তোরণ খুলে ধরতে হয়; তবে তো অসাড়ে সাড় আসে, মূঢ়ের মুখে ভাষা ফোটে, পঙ্গু হেঁটে যায়। তাই বলি, নারীকে তুলতে চাও তা' হ'লে তার হীনতার দৈন্যের ক্ষুদ্রতার আঙিনায় নেমে গিয়ে ডাক দিলে হবে না, তোমায় নিজেকে নারীত্বের শেষ পৈঠায় উঠে হাত বাড়িয়ে দীনা হতসর্বস্বাকে উপরে তুলে নিতে হবে।

নারীকে জাগাবার মতন নারী চাই, নারীত্বের ঐ আকাশ জোড়া তুষার-ধবল পূর্ণতাকে আগে বিগ্রহ ধারণ করান চাই। যে আদর্শের টানে লাখ লাখ মরা মেয়ে বাঁচবে সেই আদর্শ আগে মানবী রূপ ধরে হয়ে জন্মানো চাই। নারী শুধু মা নয়, স্ত্রী নয়, ভগ্নী নয়, সখী নয়, তাপসী নয়, নারী বহু বিচিত্রা নিখিলভাবরূপা নব নবরসময়ী—শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের ত্রিবেণী সঙ্গম। সেই পূর্ণা অখণ্ডরূপা মহামায়াকে বাঙালীর মেয়ের মাঝে আগে বাঁচাও, তার মন্ত্রপূত সঞ্জীবন স্পর্শে সব মেয়ে তা' হলে বেঁচে উঠবে।

পুরুষের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছে, বিবেকানন্দ হয়েছে, অরবিন্দ হয়েছে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন হয়েছে, সেই যুগ যুগান্তর থেকে কত মহিয়ান রূপ সব এসেছে গেছে, তবে ত' লাখ লাখ মরা পুরুষের এই জগদ্দল পাথর এইটুকু নড়েছে। নারীকেও তেমনি বড় হয়ে নারীকে তুলতে হবে। নারীর জ্ঞান, শক্তি, অর্থ, অধিকার, মুক্তি, সার্থকতা সবই চাই; তার অগণ্য অভাবের মোচন হাজার বেদনার শান্তি কত শত অপূর্ণতার পরিণতি সবই চাই। কিন্তু যে মানুষের কাজে নারীর স্পর্শে, ডাকে, সৃজন আনন্দে এত হবে সে মানুষ কি সহজ মানুষ?

তাই বলি, নারী! সাধনায় বস! তোমায় আজ

নুতন করে জন্মাতে হবে, আপনার সকল সত্তা ভরে আনন্দ শক্তি জ্ঞান খুঁজে পেতে হবে ; অন্তরের কুবের ঐশ্বর্য্য বাহিরে ঢালতে হাব, অন্তরের অন্নপূর্ণা সারদা উমা চামুণ্ডাকে বাহিরে প্রকাশ করতে হবে। নারী সমাজের চাপে, পুরুষের চাপে, শাস্ত্রের চাপে মরেনি, নারী মরেচে তার নারীত্ব হারিয়ে। সমাজ, পুরুষ, শাস্ত্র, আচার সব তাকে সেই দিন পথ ভুলিয়েছে যে দিন থেকে সে হয়েছে আত্মবিস্মৃতা! নারীকে আপনার পূর্ণতায় সফল হয়ে পুরুষকে বাঁচাতে হবে, পুরুষকে আপনার অখণ্ড মহিমায় আরোহণ করে নারীকে বাঁচাতে হবে। নারী আর পুরুষ মিলে যা' তাই সত্য, তাই সুন্দর, তাই পূর্ণ। নারীকে ছেড়ে পুরুষের সিদ্ধি নাই, পুরুষকে ছেড়ে নারীরও চতুর্ব্বর্গ নাই। পুরুষ আর নারী বলে পৃথক পৃথক কিছু নাই, একই সত্যের এ হরগৌরী অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ ; কারণ সত্য যা' তাতে বিরোধ নাই, সেখানে ভেদও সত্য এবং অভেদও সত্য।

আজ যদি নারীকে সকল দিক থেকে বাদ দিয়ে পুরুষ গড়তে বসি তা' হ'লে সে গঠন কি নির্ম্মম অঙ্গহীন ব্যাপার হয়? আমাদের সারা শৈশব যৌবন বার্দ্ধক্যভরে আদরে, শিক্ষায়, উৎসবে, মিলনে মা হয়ে স্ত্রী সখী কত কি হয়ে নারী যদি না থাকত, এই নারীর উপেক্ষাকারী জগৎ এক দিনও

চলত কি? তেমনি আজ নারীও একলা চলতে পারে না; রাজনীতি সমাজ যা কিছু বল, অমন একাঙ্গী একপেশো হয়ে এক দণ্ডও টেঁকে না; যদিও তর্কবাজ মানুষ ভাবে বুঝি টেঁকে, কিন্তু ওটা তার সেরেফ বুদ্ধির গোঁজামিল।

তাই বলি, নারীকে আজ বাঁধন ছিঁড়তে হবে এ যেমন সত্য, নতুন মিলন রচতে হবে এও তেমনি সত্য। আজ পুরুষের নারীকে মুক্তি দিতে হবে এ যেমন সত্য, নতুন জীবনে তাকে সার্থক পাওয়ায় পেতে হবে এও তেমনি সত্য। কিন্তু মুক্তি মানে যথেচ্ছাচার নয়, কি পুরুষ কি নারী কারু পক্ষেই মুক্তি মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। অশিব রূপ পুরুষ ও নারী দুইয়েতেই আছে। আমরা চাই শিবতা, কল্যাণ,—সত্য জীবন, সুন্দর জীবন, সুসমঞ্জস জীবন। বাহিরের পশুর হাতে বিড়ম্বিতা আর নিজের অন্তরের পশুর হাতে বিড়ম্বিতা এ দুই নারীই সমান দুঃখী, সমান ব্যর্থ। পশুর স্থান নারীর পায়ের তলায়, কারণ পশুরাজই শক্তির বাহন, এই পশুকে জয় করেই বশ করেই নারীর দেবীত্ব।

নারী কেন দেবী

আমরা সবাই শুনেছি এবং তা' নানা ছন্দে ও ভণিতায় কেতাবে-সন্দর্ভে লিখে থাকি, যে. ভারতে নারীত্বের আদর্শ খুব বড়। তা' খুব বড় ও জাঁকালোই বটে,কিন্তু স্বরূপতঃ সে আদর্শটা যে কি, তা' আমরা বড় একটা কেউ জানিনে! মনে মনে সে অজ্ঞানের কথা অবশ্য স্বীকার করতে লজ্জা করে, কিন্তু না করে আর উপায় নেই। ভারতের নারীত্বেরই আদর্শ শুধু নয়, ভারতের পুরুষ-নারীর গোটা জীবনের আদর্শটি অবধি এই হাজার বছর ধরে ক্রমশঃ ঘোলাটে, ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। এ জাতি এই অজ্ঞানের পাপেই আজ মৃত্যুদেবতার দ্বারস্থ! এমনতর আত্মবিস্মৃত জাতির না মরে' যে উপায় নেই। ভারত বল, চীন বল. জাপান বল, ফরাসী জার্ম্মান বল, রুস-মার্কিন মোজল-মাঞ্চু যাই বল, সব দেশের ও জাতির এক-একটী আত্মা—অন্তর-দেবতা বা soul আছে, তাদের দেউলে সেই দেবতা জাগ্রত থাকলেই তার জ্ঞানের ইঙ্গিতে, শক্তির প্রেরণায়, সত্তার আনন্দে, সেই সেই জাতি চিন্ময় হয়।

ফরাসী যা' গড়ে আর যেমন ভঙ্গীতে গড়ে, রুস তা' গড়ে না ; জার্ম্মাণ যে জীবন-শিল্পের পসরা দুনিয়ার বাজারে এনে নামায়, মার্কিনের ডালিতে ঠিক তেমনটি খুঁজে পাবে না এই জাতি-আত্মা বা দেশের অন্তর-পুরুষ অনির্দ্দেশ্য হ'লেও সত্য ও তাঁর সৃজনের প্রতি রেখাটীর মাঝে তিনি অমোঘ মৌলিকতায় দেদীপ্যমান। এই অন্তর-পুরুষটিকে জাগিয়ে রাখা, জাতির প্রাণ ও দেহ মন্দিরে এই শিব-চেতনার নিত্য পূজা বহাল রাখার উপরই জাতির জীবন নির্ভর করে। এই চেতন ভাব-ঘনকে ভুললেই ভগবানের নিয়মে সে আত্মবিস্মৃত জাতির অন্ন উঠে যায়, সে জাতি তিল তিল করে মরে!

সেই মোগল-পাঠানের তুর্ক-সওয়ারী যুগ থেকে এই গৌরাঙ্গী মোটর-সাইকেলী যুগ অবধি একটা হাজার বছর ধরে অল্পে অল্পে ভারতের জীবন-সত্য হারিয়ে যাচ্ছে,—বাহিরের আক্রমণ ও বিজেতার বল সেই মরণের সে ক্ষয়ের বাহ্য লক্ষণ মাত্র। যে পরিমাণে আমরা ভুলেছি বিশ্ব-বিধাতার জগতে ভারতের স্থান ও ভারতের দেবার স্পর্শমণি, সেই পরিমাণে এদেশের শুধু নারী নয়, পুরুষও মরে এসেছে। মরতে মরতে ক্রমশঃ আমরা গিয়ে দাঁড়িয়েছি সাংখ্যের পুরুষে ও আমাদের অন্তঃপুরের শক্তিরূপিণীরা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সাংখ্যের প্রকৃতিতে। সাংখ্যের পুরুষ খোঁড়া—হাঁটতে পারে না,

ঠুঁটো—কাজ করতে অসমর্থ; আর সাংখ্যের প্রকৃতি কাণা—দেখতে পায় না। সেই খঞ্জ পুরুষ অন্ধ প্রকৃতির কাঁধে চড়ে তার পায়ে চলে ও তার হাতে কাজ করে, আর অন্ধ প্রকৃতি খঞ্জ পুরুষের চক্ষে দেখে। এ ক্ষেত্রেও তাই, আমরা যে ঠুঁটো আর ওঁরা যে অন্ধ তা' একটু পরখ করলেই বোঝা যায়। ওঁদের কেউ বা কুরঙ্গ-নয়নী, কেউ বা পদ্ম-পলাশাক্ষী, কেউ বা পটল-চেরা আঁখি, তা' হোক—তবু ঐ আকর্ণবিশ্রান্ত অপাঙ্গেক্ষণ ঢুলু ঢুলু বিলোল চোখে দৃষ্টি নেই, আছে নয়নবাণ। ওঁরা জীবনে পথ দেখতে পান না, অন্দরের খোঁয়াড়ে ওঁদের যাবজ্জীবন জাব দেওয়া আছে, কাজেই পথ চলবার বালাইও ওঁদের নেই।

ঐ কাণা চোখের কাণা বাণে আমাদের মধ্যে যারা মরে পতি হই, তারা কিন্তু হরিণ-ফোঁড়া হই বেমালুম শব্দভেদী বাণে। এঁরা স্বয়ম্বরা বটে কিন্তু নেপথ্যে গাঁয়ের পাঁচজনে ও বাপমায়ে যাকে বেছে দেয়, এঁরা কর্ত্তব্য-বোধে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের হিসাবে তাকে বেঁধেন। আমাদের শক্তিপূজার দেশে ঠাকুর-দেবতা সব মাটীর, আর শক্তির জীবন্ত প্রতিমা মেয়েরা সব ঝুটো সোণার; মা কালীর হাতের রাঙতার খাঁড়ার মত এতেও কাটে না, রাখে না, জীবন-রণে শক্তি দেয় না; এতে মাত্র চোখ ধাঁধায়,

মন মুগ্ধ করে, জীবনের অভিনয়ে চমক লাগায় এবং কখনও কখনও মজায় মজায় ও ডুবিয়ে অধঃপাতে দেয়। এঁরা শক্তি বটে কিন্তু দুর্ব্বলের বল নয়, বোঝা। সবলের জ্ঞান ও আনন্দ নয়, শিকল

"বাহুতে তুমি গো শক্তি
হৃদয়ে তুমি গো ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

কি তত্ত্বকে লক্ষ্য করে' কবি এ-কথা বলতে পেরেছিলেন তা' আজ হিন্দুনামধারী ক'জন মানুষ বোঝে? নারী শুধু মা নয়, শুধু স্ত্রী নয়, নারী শুধু দাসী নয়, বন্ধু নয়, নারী হচ্ছে জগচ্ছক্তির বিদ্যাময়ী রূপ। ভগবান এখন আমাদের কবিতার একটা মুখরোচক বিষয়, নাম ধরে বিনিয়ে প্রার্থনা করবার ফাঁকা আওয়াজ, তাই নারীকে আদ্যাশক্তি বলাও তথৈবচ, তা' হচ্ছে প্রবন্ধের বা বক্তৃতার মসলা মাত্র। শক্তিও আমরা চিনি না, আজ শক্তিমানকেও ভুলেছি! কয়েক শ' বছরের পরাধীনতার বশে সব সত্য আমাদের ফাঁকা উপমা ও বুলিতে গিয়ে ঠেকেছে। ভগবান যে আছেন, অমোঘ সত্যে বিশ্বকে কুক্ষিগত

করে শক্তির লীলায় জগদ্বিগ্রহ হয়ে আছেন, তাঁকে যে দেখা যায়, পাওয়া যায়, জীবনকে যে উর্দ্ধমূল করে সেই ভাস্বর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা' মানুষ ভুলেছে। শক্তিতে চিনিনা বলে নারী তাই গুটিয়ে এসে ইন্দ্রিয়সেবার পুতুল হয়ে গেছে, বাংলার নারী তাই এত শ' বছর ধরে আমাদের কামনার কামিনী অথবা স্নেহকাতরা জননী, সে নব নব সৃষ্টির উৎস নয়, সে পুরুষকে দেবত্ব দেবার তপঃরূপিণী হোমশিখা নয়, সে মানবের সত্তার বৈকুণ্ঠে ও মর্ত্ত্যে সোনার সেতু নয়,—সে যৌবনের রাঙা চেলিপরা কনে বৌ, প্রৌঢ়ের ঝগড়া করবার আর সন্তান-প্রসবের গৃহিণী এবং বার্দ্ধক্যের কাশী যাত্রার ও মালা জপার সঙ্গী। এই নারী বেদ-রচয়িত্রী হ'লে ঠিক কেমনটি হয়, এই নারী অসি হাতে দেশ-রক্ষায় রণচণ্ডী সাজলে কেমন করে তার পায়ের তলায় ধরিত্রী কাঁপে, এই নারী তপস্যার দেবাসুর-যুদ্ধে সাধকের শক্তি হয়ে জীব ও ভগবানের মাঝে কি করে' যোগস্থাপন করে তখন তার সে তপস্বিনী উমার শান্ত নিমগ্ন অকামশুদ্ধ লাবণী কেমন দেখায়, তা' এই দেশের অমৃতের অধিকারী আর্য্যপুত্ররা ভুলে গেছে। আবার সেই স্মৃতি জাগাও, সেই শক্তির তন্ত্র উদ্ধার কর, তবে নারী জাগবে, তবে মানবী দেবী ভগবতী হবে। ভারতের নারীত্বেরও আদর্শ আকাশ-জোড়া

মানুষ গড়া

তুষার-ধবল কৈলাস-চূড়ার মত জিনিস, তার মাথা থেকে যে ভোগবতী গঙ্গা নেমে আসে, সেই পতিত-পাবনীই হ'লো মা,—মা নারীত্বের অখণ্ড মহিমার সবটুকু নয়, স্ত্রীও সবটুকু নয়।

———

অষ্টম পর্ব্ব ।

সত্যের পথ ।

চারিবর্ণের নারায়ণ

য়ুরোপের ইতিহাসের গতি—তাদের সভ্যতার ধারা ভেদমূলক, ভারতের ধারা সামঞ্জস্যমূলক। একজন গড়ে খণ্ডকে ব্যক্তিকে একটি শ্রেণী বা স্তরকে ফুটিয়ে সার্থক করে তা' গড়তে চায়; আর একজন যা' গড়ে, খুব উঁচুতে উঠে একটা সমগ্র দৃষ্টি, বৃহৎ ধারণা দিয়ে সবটাকে দেখে পূর্ণাবয়ব কিছু গড়তে চায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ, তা' হলেই সারা য়ুরোপের মহাজাতির জীবন-ভঙ্গী বুঝবে। ও-সব দেশে জাতীয় জীবনের চারটি যুগ, চারটি বর্ণ ধরে চারবার ওরা জাগতে চেয়েছে। প্রথম ছিল ব্রাহ্মণ যুগ, যখন ধর্ম্ম ছিল জীবনের শক্তি, কাজের প্রেরণা, পোপ আর পুরোহিত ছিল রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প এবং সাহিত্যের স্রষ্টা ও বিধাতা। তারপর এল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—ক্ষাত্র-যুগ; ইতিহাসের যে যুগের নাম middle ages, যোদ্ধা ও বীর যখন হলো সব কিছুর নিয়ন্তা—ক্ষত্রিয়ের অসির জ্যোতি যখন ব্রাহ্মণের পূজার বাতি ম্লান করে আনল। সে যুগ যখন কাটল, তখন তার বিরুদ্ধে জাগল বৈশ্য শক্তি, তখন বণিক হল প্রায় সসাগরা পৃথিবীর

রাজা, ধনকুবের ব্যবসায়ীর হাতের খেলার পুতুল হ'ল পুরোহিত আর যোদ্ধা, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় দুই-ই। আজ আবার এই বৈশ্য তরঙ্গেরও প্রতিক্রিয়া আসছে, শূদ্র জাগছে, লেবার ও প্রলিটারিয়েট উপরের তিন বর্ণকে মুছে ফেলে নিজের একাঙ্গী প্রাধান্য গড়ছে।

ভারত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভারতের ঋষি তার ত্রিকালভেদী জ্ঞান নয়নে দেখেছিল, যে চারবর্ণ হচ্ছে মানুষের সহজরূপ ভগবানের লীলার ঢেউ, চারটি বর্ণের চারিটিই পরস্পরের প্রাণ; কেউ কারও বিরোধী নয়। যে শক্তি আপন আনন্দের প্রেরণায় তার নিগূঢ় সৃজনী ছন্দের বিলাসে এই বিচিত্র জীবজগত গড়েছে মানুষে তার সব চেয়ে বৃহৎ অবতরণ, সব চেয়ে সার্থক বিগ্রহ ধারণ। ব্রাহ্মণ সে বিগ্রহের মাথা, ক্ষত্রীয় তার বাহু, বৈশ্য তার উরু আর শুদ্র তার পা, এই হল প্রকট ভগবানের জ্ঞান-শক্তি-আনন্দময় দেহ। তাই ভারতের ঋষি সমাজ গড়েছিল চার বর্ণের একটি একটিকে ফুটিয়ে নয়, চারটিকেই একত্রে মিলিয়ে, চারটিরই অচ্ছেদ্য পরিণয়ে। ব্রাহ্মণ যার জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যার শক্তি, বৈশ্য যার সৃজনানন্দের নিপুণতা, শূদ্র যার প্রেম ও আত্ম- দান, সে সমাজ যে চার জনকে নিয়েই পূর্ণাঙ্গ এদের কোনটাকে বাদ দিয়ে যে তার শিব, বিগ্রহের পরম কল্যাণ অটুট থাকে না।

যে দিন থেকে হিন্দুর জাতীয় জীবন নদীতে ভাটা এল, ঋষি তার উচ্চ আসন (Higher poise) হারিয়ে ক্ষুদ্র-দৃষ্টী ক্ষুদ্র-হৃদয় ক্ষুদ্র-প্রাণ হয়ে পড়ল, সেই দিন থেকে এই সহজ ভাগবত বর্ণ মরে গিয়ে জাতের সৃষ্টি হল। ক্ষুদ্র-দৃষ্টি ব্রাহ্মণ বলল আমি সবার বড়, আমার পূজা কর, ক্ষুদ্র-প্রাণ ক্ষত্রিয় বলল আমার অসির উপর রাজচক্রবর্ত্তিত্ব, ব্রাহ্মণ আমার পারিষদ হও, ক্ষুদ্র প্রতিভা বৈশ্য ধনলোলুপ হয়ে আর ক্ষুদ্র হৃদয় শূদ্র সেবালোলুপ শরণলোলুপ হয়ে উপরের দুই বর্ণের হল দাস। সেই দিন থেকে আর্য্য সভ্যতার জীবনের মন্ত্র হারিয়ে গেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে বাহিরের শক্তি এসে এই ছন্দহারা জাতকে গ্রাস করেছে।

কিন্তু যে দিন থেকে ভারতে তথা বঙ্গে আবার ক্ষীণ জীবনের সাড়া আসতে আরম্ভ হল, সেই দিন থেকে অল্পে অল্পে এই মৃত চার বর্ণে আবার বসন্ত স্পর্শ জাগছে। বিবেকানন্দ এসে দরিদ্র নারায়ণের সেবার ছলে শূদ্রের ধর্ম্মকে তুললেন, "বন্দে-মাতরম্" গানের সুরে বাঁধা সেই স্বদেশী যুগ এসে স্বার্থের বৈশ্য, ধন লালসার বৈশ্য, সমাজদ্রোহী বৈশ্যকে তেমনি পাবন করে জাতির ও সমাজের কল্যাণে লাগিয়ে নিল। তার পর রক্তরাঙা বিপ্লবের যুগ এসে মরা ক্ষত্রিয়কে বাঁচাল মরণভীত মানুষকে পরের জন্য মরতে

শেখাল। তার পর দেখ এবার আবার অরবিন্দ বলছেন ঋষির কথা, সত্যের দেবতার কথা, ব্রাহ্মণের ধ্যান ও তপস্যার কথা ; এবার ব্রাহ্মণও বাঁচবে, ব্রাহ্মণ ও নব সাধনায় নূতন সত্যে সর্ব্বপাবক জীবন পাবে।

চারবর্ণগত পূর্ণ-নারায়ণ আবার ভারতে জাগছেন, আবার জীবনের চার বেদ, চতুর্দ্ধা শক্তি, চতুর্মুখী প্রেরণা রূপ নিচ্ছে। য়ুরোপের খণ্ডতা নকল করে আমাদের কল্যাণ নাই, সেখানকার মিলিটারিজম, কমার্সিয়ালিজম প্রলিটেরিয়ানিজম সেখানকার সমাজ-জীবনের বিচিত্র ভঙ্গী, এক এক বারে এক একটিকে ফুটিয়ে তারা সমগ্রকে গড়বে চারিটীর ব্যর্থতায় তবে হয়ত তারা পূর্ণের সন্ধান পাবে। তাই বলে তাদের ভুল আমরা যে কাণার মত নকল করতে যাই সেটি আমাদের পলিটিকাল গোলামীর—শূদ্র মনেরই ধর্ম্ম বই আর কিছু নয়।

এই সামঞ্জস্যের, এই পূর্ণের, এই সমগ্রের, এই অখণ্ডের দেশে শুধু ধর্ম্ম যে কাণা, শুধু রাজনীতি যে কাণা, শুধু গণতন্ত্র যে কাণা, শুধু বৈশ্যপ্রাণতা যে কাণা। এখানে চাই এমন একটি বৃহৎ অখণ্ড সৃষ্টি যা য়ুরোপের সমস্ত ইতিহাসের সব ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গকে মহা জলধি হয়ে বুকে ধরবে, একেবারে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র সকল তন্ত্রকে সফল করবে।

সাধন-সত্য

ভগবান এবার জীব হবেন, জীব এবার ভগবান হবে।

স্বর্গ ও মর্ত্তের মাঝে সোণার সিঁড়ি ভেঙ্গে গেছিল, তাই এবার গড়ে উঠে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে আনন্দের বাঁধনে এক করে দেবে। তোমরা দু' এক জন অবতার কল্প মানুষ দেখেছ,যোগে মুক্ত ও আনন্দ-সিদ্ধির শান্ত মানুষ দেখেছ, কিন্তু সব মানুষে অনন্ত তার মধুর পূর্ণতায় ফুটতে পারে তা' কি কখন দেখেছ সেই দুঃসাধ্য সাধনের দিন এবার আসতে চায়।

এতটুকু প্রাণ মনের এই চোদ্দ পোয়া মানুষই মানুষ নয়। মানুষের মাঝে কত লোক লোকান্তর কত ধামই না আছে — সেই ভূর্ভুব-সত্য তপলোক-ব্যাপী তোমার বৃহৎ অখণ্ড অন্তরটাই নারায়ণ, বাহিরের এই জড় তুমি তার ইঙ্গিত মাত্র। সেই নারায়ণই এই নর হয়ে ফুটেছে, মুক্তির ঠাকুর বাঁধনের মাঝে রূপ নিয়েছে। চির শান্ত আনন্দ-নগরে যার বসতি, সত্যই যার প্রকাশ, অফুরন্ত জ্ঞান ও শক্তির সেই ভগবানই ব্যর্থ হয়ে বন্ধনের মাঝে কামনার মানুষ হয়েছেন। প্রকাশ-

পাগল সেই ঠাকুর প্রকাশ হবেন, তাই তো এই জগৎ রচনার আয়োজন, তাই তো মানুষের এমন করে বারবার দেহ-ধারণ। ভগবানের রূপ নেবার সেই প্রেরণা সার্থক হয় নি বলেই না তুমি খণ্ড জীব ?

কিন্তু ভগবানের প্রেরণা কি ব্যর্থ হয় ? তার যে অনিবার্য্য স্বতঃসিদ্ধ অমোঘ গতি। ও ব্যর্থতাও যে তার সার্থক হবার ধারা, এ ধারার একটুও মিথ্যা নয়, যুগে যুগে এক ছোট সত্য থেকে আর এক বড় সত্যেই তার রূপ ফুটছে, ধামের পর ধাম উজ্জ্বল করে মানবে দেবত্ব নামছে, তিল তিল করে অমোঘ লীলায় তার প্রেরণা সফল হচ্ছে।

নর-নারায়ণের এ সত্য বেদের ঋষিরা একবার বুঝেছিলেন। সে সত্য হারিয়ে গিয়ে উপনিষদের যুগে আবার ফিরে আসে—কিন্তু মানুষের সত্বার মাত্র একটি ধাম মানুষত্বর রূপান্তর করে দিয়ে যায়, সে'বার ভগবান মানুষের জ্ঞানের মাঝে প্রকাশ হয়েছিলেন, মানুষ উপরটুকুতে মাত্র দেবতা হতে শিখেছিল। তারপর ঈশা শ্রীচৈতন্য মানুষের হৃদয়ে ভাগবত জ্যোতি নামিয়ে সেই ধামে মানুষকে ভগবান করে গেছেন ; আবার তন্ত্রের যুগে দেখ প্রাণের খেলা উপরে বিজ্ঞানে ও আনন্দে তুলে মানুষ নতুন করে নতুন ধামে দেবতা হবার পথ খুঁজেছে।

এবার এই সকল ধামে ভগবান পূর্ণ প্রকাশে রূপ নেবেন বলেই পূর্ণযোগ এ যুগের সত্য। এই যুগ-সত্য তোমরা আপন জীবনে কে কে সফল করবে, তারা একবার আপনাতে ফিরে এস। অসাধ্য-সাধনের বীর সাধক কে কোথায় আছ, এস। মুক্তির জগৎ গড়বার কর্ম্মী কে কোথায় আছ বাহির থেকে অন্তরে ফিরে এস। তোমরা আত্ম-সমর্পণে শান্ত হও, জীবনকে যোগময় কর, তারপর সেই শুদ্ধ আধারে সপ্ত ধাম আলো করে একবারে রূপান্তর করে ভগবান তাঁর ষড়ৈশ্বর্য্য জাগুন। মানুষ দেবতা হয়ে নতুন জগৎ রচনা করুক।

সাধন-সমরে

যুগে যুগে ভগবান যখনই তাঁর লীলায় জাগেন তখনই দুই-রূপে জাগেন—দৈত্য আর দেবতায়। যেমন উজ্জ্বল কালো মণির গায়ে সোণার হৈমদ্যুতি ঝলমল করে ভাল, যেমন পটের গায়ে শীতল নিবিড় রঙের কোলে মানুষের মুখ আঁকলেই তা' লাবণ্যে হয় কমলের মত ঢলঢল, তেমনি দেবকীর পাষাণ বুকে ধরেই মানুষ ভগবানকে জন্ম দেয়। যে রাত্রে জন্মাষ্টমী সে রাত্র যে চির দিনই কৃষ্ণপক্ষের তিমির রজনী, সে কাল-নিশায় আবার ঝড় বিদ্যুৎ বাজ বিভীষিকায় "পন্থ বিজন অতি ঘোর"।

এ আঁধারকে তোমরা ডরিও না, বাঁধনকে তোমরা মুক্তি রতনের মণিকোষ বলেই নিও, ভয়ের মাঝে তোমরা বিশ্বরাণীর বরহস্তের বরাভয়কেই দেখতে শেখ। কারণ কি ব্যক্তি, কি জাতি, যে চায় আবার ফিরে সার্থক জনম জন্মাতে, যে চায় বৈকুণ্ঠেশ্বরের রত্নকিরীট মাথায় নিতে, তাকেই যে কৃষ্ণা প্রলয় রজনীতে নারায়ণ হয়ে জন্মাতে হবে। কারণ মানুষের বুকে দেবতা যখন অসুরের পীড়নে কাঁদে, তখন দেবভয়হারী ভগবান

জাগেন। আপনার অন্তরের পরম স্বরূপকে ভুলে ক্ষুদ্র হয়ে থেক না, নরকে আপনার নারায়ণে বিগ্রহবান করে সবল হতে দাও; কারণ তোমাদের যে অসাধ্য সাধন করে দেখাতে হবে, বালকের কোমল হস্তে গিরিগোবর্দ্ধন তুলে ধরতে হবে, কালীয় নাগের সহস্র ফণায় জগতভয়হারী নৃত্য নাচতে হবে, এ জাতির বহু শতাব্দীর হীনতার গরল গণ্ডুষে পান করতে হবে। তা' কি ক্ষুদ্র মানুষ পারে?

মানুষ একটা মূর্ত্ত দেবাসুর সংগ্রাম। মানুষকে বড় হতে হলে এই সংগ্রামে জয়ী হতে হয়, এই আত্মজয় সাধনায় সিদ্ধ হতে হয়। আত্মসিদ্ধি বিনা দেশ বড় হবে না, শক্তির হাজার হাজার বরপুত্র বিনা এ মরা জাতি বাঁচবে না; আপনাকে বিভুতিময় করে না পেলে দেশজননীকে রাজরাজেশ্বরীরূপে পাবে না। তুমি নিঃস্ব অন্নহীন, তাই সে ধুমাবতী; তুমি শক্তিহারা আত্মঘাতী, তাই মা তোমার ছিন্নমস্তা বগলা; তুমি স্বার্থপর, কলহকারী, তাই দেশমাতৃকার রূপ ভীমা রক্তমুখী তারা। মানুষ ভগবানের শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি; তুমি তাঁর অবিদ্যার আঁধারের কোলে জন্মেছ, অবিদ্যাময়ী প্রকৃতি তোমার মা। এই মাকে জয় না করলে মায়ের ছেলে হওয়া যায় না, শক্তিকে জয় করে আয়ত্ত করেই নর চির দিন নারায়ণ। তাই কারাগারে কৃষ্ণাবতার, সাগরমন্থনে লক্ষ্মী,

স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ লীলাই হচ্ছে মানুষের বৃহৎ হবার সাধনা।

হাজার হাজার ক্ষুদ্রের দেশ ক্ষুদ্রই থেকে যায়, তাই আফগানিস্থান স্বাধীন হয়েও জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার জগতে আজও পার্ব্বত্য মূষিক। মানুষের মুক্তি মানে জনে জনে তার রাজচক্রবর্ত্তীত্ব, মানুষের ডিমোক্র্যাশী মানে জনে জনে তার স্ব-তন্ত্রতা, মানুষের শক্তি মানে জনে জনে তার জ্ঞানের পরমধাম। ভগবান ভারতে সেই দিন তাঁর শক্তির দেশ-জোড়া কাঙাল রূপ—ধূমাবতী রূপ সম্বরণ করবেন, যেদিন তোমরা একটি নারায়ণী সেনা গড়ে তুলবে। দেশবাসী যত বড় হবে, দেশও তত বড় মুক্তিতে মুক্ত হবে; এই শ্মশানে বসে তোমরা প্রতি জনে সিদ্ধ শক্তিধর হবে বলেই ভগবান সোণার ভারত জুড়ে মহা শ্মশান রচনা করেছেন। তিনি চাইছেন পূর্ণ মানুষ, ধৈর্য্যের বীর; ক্ষুদ্রতার নৃসিংহ, অহঙ্কারের কুঠার-হস্ত পরশুরাম, দশস্কন্ধ স্বার্থের দলনকারী শ্রীরামচন্দ্র; ভগবান চাইছেন মানুষে ভাগবত খেলা খেলতে ক্ষুদ্রে যারা তুষ্ট, অন্ন বস্ত্রের স্বরাজের যারা স্বরাজী, এ যুগ তাদের নয়। এতটুকু ইমারত গড়তে গিয়ে তারা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে পারবে না, ভূত ছাড়াবার মন্ত্রে দেবতার আবাহন হবে না।

এ দেশ ভাবতে পারে বড় কথা, বলতে পারে মুক্তির নাম, কিন্তু জীবনে এ দেশের মানুষ সেই বুকে-হাঁটা ক্ষুদ্র কীট। মন তাদের কল্পনার আকাশচারী বিহঙ্গ কিন্তু দেহ ও প্রাণ আকাশকে ভয় করে, কাদায় চরে। নাগ-কন্যার উত্তমাঙ্গ মানুষ আর অধমাঙ্গ নাগ, মৎস্য-কন্যার উত্তমাঙ্গ মানুষ আর অধমাঙ্গ মাছ; আমাদেরও তাই। সেই জন্যে ক্ষুদ্রের বৃহৎ আয়োজন বামনের চাঁদ ধরার মত প্রহসনে গিয়ে দাঁড়ায় আমরা যা' ভাবতে পারি তা' গড়বার মত বৃহৎ প্রাণ আমাদের নেই, যে মুক্তি চাই তাকে পূর্ণাবয়ব করবার সামর্থ্য আমরা হারিয়েছি। তাই এখন চাই মনের নতুন জন্ম, প্রাণের নতুন জন্ম, দেহের নতুন জন্ম; পূর্ণাবয়ব সুসমঞ্জস তেজোব্যঞ্জক মানুষ, যে সত্যকে জগতে আনতে পারে ও রূপ দিতে পারে, যে হাজার যুগের মানুষের গড়া মন্ত্র তন্ত্র বাঁধন শিকল নিজে কেটে মুক্তি গড়তে পারে। যে রুদ্রের মত ভাঙতে জানে, ব্রহ্মার মত গড়তে জানে, বিষ্ণুর মত রক্ষা করতে জানে। মানুষের মহত্বেই জগতে মুক্তি; পশু, মানুষ আর দেবতা একই শক্তির তিনটি ধাম; এই ত্রিলোক যে জয় করেছে, পশুকে বাহন করে আপনার বিগ্রহে দেবতাকে' নামিয়েছে সেই জীবই শিব।

মায়ার সেনা

মানুষ অনন্তশায়ী নারায়ণ, তার গোপন স্বরূপের অনন্ত কুণ্ডলীর নাগশয্যায় সে যেন এতটুকু জীব হয়ে ভাসছে। নিজেরই মায়ায় আপনাকে গুটিয়ে সে বিরাট থেকে এতটুকু হয়েছে আনন্দের ছোট ছোট বিন্দুগুলি আস্বাদন করবার জন্যে। তাই বলতে গেলে এটা তার আত্মবিস্মরণের লীলা, ঘুমের খেলা, তাই আপনার শেষ শয্যায় জীবরূপী নারায়ণ আপনাকে ভুলে নিদ্রিত। এই রকমে আপনার ষড়ৈশ্বর্য্য, নিজের অনন্ত সিদ্ধি, জ্ঞান বিভূতি ভুলতে গিয়ে শিবকে আপনারই শক্তিরূপিনী মায়ার অধীন হতে হয়, মহামায়া সেখানে মা হয়ে শিবকে ভ্রান্তির মাঝে জন্ম দেয় জীব রূপে, মহামায়া আদ্যাশক্তি তাই জীবের জননী; কিন্তু পাশমুক্ত শিবের অর্দ্ধাঙ্গ—তার গৃহিণী।

মায়া মানেই বাঁধন, সীমা, ক্ষুদ্রতা, দৈন্য, বৃহৎকে ভেঙে ভেঙে গুটিয়ে গুটিয়ে ছোট করা; সত্যকে বিকৃত করে, ঢেকে মিথ্যার মোহন ছবি গড়া। মায়ার রাজ্যে তাই সত্য

নিয়ম উল্টে গেছে, এখানে জগতের ঈশ্বর মায়াধীন, শিব হয়েছে কাঙাল ভিখারী, আর মায়া অন্নপূর্ণা সেজে তাকে অন্ন দেয়, লালন করে। মায়া নিবিড় সতিমির অমানিশি, তাই শিবের সত্য-ঘন তনুর চেয়ে ছোট হলেও তা' অকুল অনন্ত অনাদি দেখায়, আসলে জ্যোতির অখণ্ড মণ্ডলের নাভির মাঝে এই মায়ার কালো আঁধার রাজ্য, তার ঊর্দ্ধে নিম্নে বামে দক্ষিণে কোটি চন্দ্র সুশীতল ভাগবতী জ্যোতির বেষ্টনী, মায়া ঐ জ্যোতিরই মেয়ে, ঐ জ্যোতির অংশকেই আপন রাজ্যে পেয়ে স্নেহকুহকে ঢেকে সন্তান করে বুকে ধরে।

এই মায়া শুধু শক্তির দেবতা, বামমার্গী কালী; শক্তি যেখানে জ্ঞানহারা সেই খানেই সে প্রমত্তা শিবদলনী কালী। এ মায়ের ডাইনে বাঁয়ে ডাকিনী যোগিনী, আগে পিছে মেঘের মত কালো দানাদৈত্যের বাহিনী। এরা সব আঁধারের শক্তি—Power of darkness, মায়ার সেনা। এই সেনার বলে মা সন্তানকে বশে রাখেন, আলোকের তরঙ্গ ঢেকে শীতল স্নিগ্ধ আঁধারঘন কোল খানি বিছিয়ে দিয়ে জীবরূপী পুত্রকে বেঁধে রাখেন। কালদুহিতা কালীর রাজ্যে ধ্বংসের নামই সৃষ্টি, যত ভাঙা যায়—ছোট করে এতটুকু করে আনা যায়, তার স্নেহক্ষুব্ধ হৃদয়ের ভোগপুত্রট ততই হয় নিখুঁৎ

নিটোল, পূর্ণাবয়ব ও সুঠাম। এই সব দানার দল কালো কালো পাখা মেলে সন্দেহ, বিস্মৃতি, আলস্য ও ঘুমঘোরে মায়ের সন্তানের চক্ষু থেকে সত্যরাজ্য ঢেকে রাখে; সত্য যা, বৃহৎ যা, অমোঘ যা, ভাগবৎ যা কিছু তাকে বিকৃতি করে মিথ্যায়, ক্ষণিকে, ক্ষুদ্রে, সসীমে, ভঙ্গুরে, জড়ে সুন্দর কুহকময় করে দেখায়। তাই পুত্র আপন পরম ধামের সন্ধান পায় না। তাকে জাগাতে ও সংবাদ দিতে তার বৈকুণ্ঠ থেকে অহরহই ডাক আসছে, কিন্তু সে সব জ্যোতির সেনা এখানে এই ঘনঘোর তমিস্ররাজ্যে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ম্লান হয়ে যায়, ভূপতিত নির্ব্বাণ উল্কা পিণ্ডের মত তাদের বুকের সত্যটুকু হারিয়ে গিয়ে পড়ে থাকে জড়তন্তু।•

সাধনা মানে মায়ার পাকগুলি খুলে খুলে আবার প্রসারিত হওয়া, নারায়ণের মৎস্যরূপের মত বাড়তে বাড়তে অনন্ত সাগর ভরে বিশ্বরূপে উদয় হওয়া। যখনই মানুষ এই ডাক এই স্মৃতি কোন গতিকে পায় তখন সংগ্রাম বেধে যায়, সাধনা মানেই তাই। পুত্রের মায়ের সঙ্গে সংগ্রাম— তখনই সাধক গায়—

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।

তোমার নীচের জীব প্রকৃতিই তোমার অবিদ্যা, যখন

তুমি রথে বোসো, এই বিশ্ববিমোহিনী শক্তিকে বশ করবার জয় করবার জন্যে, বুকের ওপর চড়া নৃত্যময়ী কালীকে গৌরী করে বামে নেবার জন্যে, তখনই যুদ্ধ বেধে যায়। সমস্ত সাধনাটাই এ হিসাবে একটা দেবাসুর সংগ্রাম, অন্তরের জ্ঞাননেত্র খুললে সাধক দেখতে পায় কোথায় এই কুরুক্ষেত্র—তার সাধনভূমি; সেখানে এক দিকে মায়ের ডাকিনী যোগিনীর মায়াবাহিনী আর একদিকে ভগবানের জ্যোতির সেনা, মাঝে তার বসবার আসন। এ আসনে বসে আত্মজয় করে নিজের স্বরূপে ফিরতে পারে সেই যে অসীম ধৈর্য্য ধরে, অসীম সাহস রাখে, অসীম পণ বাঁধে, অসীম করে সব গুণই শরীরে রাখে। সাধকের অনন্ত নীল নভোরূপী স্বরূপ যত জাগে, তত সে নভোমণ্ডলে উদিত এই জীব চন্দ্র কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে মায়ার আঁধার জগতের জ্যোৎস্না বান এনে আলোর বৈকুণ্ঠে তাকে পরিণত করে।

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্

এই গঙ্গামৃত্তিকায় গড়া সাগর-চরণ-চুম্বিতা আমার মা এই নবধান্যে শ্যামা নদীহারশুভ্রা বনশ্রীকান্তা ক্ষীরপয়োধরা আমার মা। এই হিমাচলকুন্তলা তুষার-কিরীটিনী জ্যোৎস্না-ধবলা বঙ্গলক্ষ্মী আমার মা। একবার নয়, শতবার সহস্রবার এই সুজলা তন্বী শ্যামা আম্রগন্ধপুলকিতা মায়ের সন্তান আমি বাঙ্গালী। এই মা আমার শতদলদলবাসিনী বীণাকরা সরস্বতী, এই মা আমার রক্তাম্বরা কমলালয়া লক্ষ্মী, মা-ই আমার নর-মুণ্ডাস্থিভীষণা খড়্গধারিণী চতুর্ভুজা শ্যামা, এই মা আমার রূপে রূপে বরাভয়া বিশ্বমায়া জগন্মাতা। বাঙালী! তোমরা এই মায়ের ভজনা কর, মনে রেখো, আগে এই মায়ের কোলজোড়া সন্তান হয়ে তবে তোমরা সার্থক ভারতবাসী।

এই মায়ের বঙ্কিম, এই মায়ের জগদীশ, এই মায়ের রবীন্দ্র, এই মায়ের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, এই মায়ের সার্থক সন্তান অরবিন্দ আজ জগৎপূজ্য। সে যে এই মায়ের মাটির গুণ। এ মাটিতে অঘটন ঘটায়, পরশমাণির বিভূতিতে বিভূতিময় এ;

মাটি লোহাকে সোনা করে, চিন্ময় পাপহারী শক্তি-পীঠ এই মাটিতে জন্মে মানুষ দেবতা হয়, আনন্দময়ী পার্ব্বতীর অঙ্গচন্দনের মাটির গড়া অস্থিতেও অসুরনধৌত বিনাশন ত্রিলোক-ভয়হারী বাজ গড়ে।

তাই, বাঙ্গালী! বিস্মৃত হইও না, যে, এ মায়ের সন্তান বলেই তুমি ধন্ত মানুষ, এই অমৃতময়ীর অমরপুত্র বলেই তুমি সফল ভারতবাসী। বিস্মৃত হও না, যে, এ মা-হারার দেশ নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, জীবন নাই; আবার মাতৃবৎসলের জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, সিদ্ধি আছে; নাই কি? সুরনর-বন্দিতা আসিন্ধুহিমাচল-প্রতিমা দেশলক্ষ্মী যার মা, তার নাই কি? কিন্তু সন্তান যদি শক্তিময়ীকে পায় তবে তো সে শক্তিমান? এই দেশবিগ্রহধারিণী মৃণ্ময়ীকে সাধকসন্তান যদি সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মশক্তিরূপে পায় তবে তো সে জ্ঞানী? জরামরণ কঙ্কালময়ীর অশিবা মায়ারূপ ভেদ করে অমৃতঘনা আনন্দময়ীকে দেখে, তবে তো সে অজর অমর, আনন্দময় শিব?

তোমাদের মুক্ত স্বাধীন সর্ব্বসিদ্ধিপূর্ণ দেশ হবে, মহৎ 'ভয়হারী ধর্ম্ম হবে, জীবন্ত চতুর্ব্বর্গদায়ী সমাজ হবে', নূতন চারু কলা শিল্প সাহিত্য হবে, অথচ তোমরা থাকবে দীন ক্ষুদ্র স্বার্থপর অশুদ্ধ মানুষ। তাও কি হয়? মানুষ তো কেবল

ভোগ সুখের জড় যন্ত্র নয়, মানুষ যে জগৎলক্ষ্মীর কমলকরের অমৃত ভাণ্ড, মানুষ যে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সত্যসংকল্প মানস-পুত্র, মানুষ যে ভগবানের প্রলয়ের অস্ত্র, সৃষ্টির বর, স্থিতির নাভিকমল। হতে পারলে মনুষ্য কি নয়?

স্মরণ রেখো, দেশকে ক্ষুদ্র মানুষ বড় করতে পারবে না, দেবতার পেয় জীবন-অমৃত কখনও অসুরের পেয় হবে না। তাই তোমায় শক্তিরূপার সাধন করতে হবে,আপনাকে নতুন করে তিল তিল সৃজনে গড়তে হবে। পথের মাঝে পড়ে ভিখারীর মত পথ অবরোধ করে কাঁদলে শক্তিমানের মাথার রাজমুকুট তোমার মাথায় আসবে না। তোমার নবজীবন যে সাধনার ধন, তোমার নবজীবন যে কঠিন তপস্যার লভ্য, তোমার নবজীবন যে মহাসমরের বিজয়-বৈজয়ন্তী, তোমার নব জন্ম যে আত্মবিভূতি অর্জ্জনের—নর-নারায়ণের পথ।

সমাজের সাধক বাঙালীকে আগে অসাধ্য-সাধক হতে হবে, জীবন-হিমাচলের পাষাণ কেটে কেটে আপন অন্তরের সুরলোক থেকে ভোগবতী অমর মন্দাকিনী নামিয়ে আনতে হবে। তার জন্যে চাই নূতন মন, নূতন দেহ, অমৃত-সঞ্জীবিত দেববর-লব্ধ নূতন মাতৃসেনা। তোমায় সেই মানুষ হতে হবে যার হৃদয়ে ধৈর্য্য, নয়নে অগ্নি, অধরে হাস্য, প্রাণে শক্তির একটানা গঙ্গা, শরীরে দেববাঞ্ছিত লাবণ্য, বুদ্ধিতে স্থিতধী সর্ব্বলোক-

বিসারী জ্ঞান। যার বাহুতে শরণ, চরণে ধরণী, মাথায় গগন-চন্দ্রাতপ, ললাটে ভবিষ্যতের জ্যোতি। বাঙালী! আগে তপোমগ্ন শুভ্র শিবতনু হিমাচলকে আপনাতে মহিমায় সার্থক কর, আগে পতিতপাবনী দ্রব-ব্রহ্মরূপা ঐ সর্ব্বার্থসাধিকা জাহ্নবী ধারাকে মুক্ত জীবনজলে সার্থক কর; আগে এই যুগকে কর কর্ম্মীর যুগ, সাধকের যুগ, সৃজনের যুগ, সত্য উদ্ধারের যুগ। আগে সহস্রমুখ হও, সিসৃক্ষু হও, সফল হও,—বাঙলা যে সত্যের প্রতিমা সেই সত্যের ঋষি হও, তারপর আপনাকে ভারতবাসী বলে পরিচয় দিও। এই যে তোমার জীবন-বেদ কত শতাব্দির প্রলয়-পায়োধি জলে ডুবে আছে নারায়ণ-বিগ্রহ ধরে তোমায় এই লুপ্ত বেদ আগে উদ্ধার করতে হবে, তবে বাঙালী হবে জাতি, তবে বাঙালী হবে নব ভারতবর্ষের স্রষ্টা।

বৃহতের ডাক

মানুষ তার জীবনে কতকটা সজ্ঞানে কিন্তু অনেকখানি অজ্ঞানে চায় খণ্ডতার দুঃখ থেকে মুক্তি, তার পূর্ণতার সমৃদ্ধি, জ্ঞানের মহিমা, তার শক্তির ঈশীত্ব, আনন্দের নিত্যধাম। সে সব-কিছু জানতে চায়, নিখিল বিশ্বকে আপনার আয়ত্বে কুড়িয়ে পেতে চায়, অনেক কিছু সুন্দর মধুর বস্তু ভোগ করতে চায়। এই চাওয়াই তার সারা জীবনের চাওয়া, এরির তাড়ায় তার যত অধীরতা, যত ছুটাছুটি, যত দুঃখ। মানুষের ভিতরে থেকে দেবতা তার দেবত্ব, তার ইন্দ্রপুরী, কুবের সম্পদ, তার অমরত্ব চাইছে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রে সেই বিরাট ক্ষুধা ধরতে পারছে না বলেই যন্ত্রের এ বিড়ম্বনা; সেই সাগরের জোয়ার এই নদীর বুকে ফেঁপে উঠছে বলেই এর দু'কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস, সেই পরম দয়িতের বাঁশী মন প্রাণ দেহের সকল কুঞ্জ ভরে বাজছে বলেই এই ব্রজপুরী ভরে এত বেদনা।

রাজপুত্র যদি চীর কন্থা পরা ভিখারী সাজে, তা' হ'লে সে হয় বড় করুণ দৃশ্য। দশদিক্‌ আলোকারী ভাস্বর তপন যদি রাহুগ্রাসে পড়ে তা' হ'লে তা' দেখায় বড় ম্লান, বড় হীন-প্রভা, বড় পিঙ্গল। মানুষের বুকেও অনন্তের অধীশ্বর মায়ার পতি যখন এতটুকু ক্ষুদ্র হন, তখন তাই তাও হয় বড় বিড়ম্বনার

হিমাচল থেকে সাগরতট চুম্বিতা এত বড় রজতবেণী জাহ্নবীকে যদি একটি কৌটার মধ্যে ধরা যায় তা' হলে সে কৌটার কি দুর্দ্দশা হয় বল দেখি ? এ ক্ষেত্রেও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, অসীম এতটুকুর মাঝে এসে বাসা বেঁধেছে, ভগবান তাঁর লীলার কণায় পিপীলিকা হয়ে আনন্দ আস্বাদন করছেন।

অন্তরে আমরা এই বৃহত্তের ধর্ম্ম, ভুমার প্রেরণা, দেবতার আনন্দ নিয়ে তাই হাজার হাজার বাসনার ফেরে পড়ে গেছি এই যে দেহাশ্রয়ী ছোট অহংকার তার এত বড়াই এই জন্য যে, সে বিরাট পুরুষের ছায়া! তাই অধম হতেও অধম, দরিদ্র হতেও দরিদ্র, দুর্ব্বল হতেও দুর্ব্বল মানুষ নিজের কাছে আঙুল ফুলে কলাগাছ। দৈন্য মানুষ বহু কষ্টে অভ্যাস করে, ভয়ে ভয়ে শেখে, কিন্তু মহত্ব ও গর্ব্ব তার স্বভাবজ। উপরের রাগিনী নীচে ছোট যন্ত্রে বিকৃত হয়ে বাজছে, তারই নামঅহঙ্কার দেহ মন প্রাণকে যদি মানুষ নিজের বড় আমির কোলে কুড়িয়ে পায় তা হ'লেই কেবল এই অহংকারের ল্যাটা চোকে, নিজেকে সর্ব্বেশ্বর জেনে মানুষ শান্ত হয়, বড়র সঙ দেওয়া তার ফুরিয়ে যায়।

এই দেখ না, আমাদের সবজান্তা মন বুদ্ধির ফোঁপর-দালাল। সে একটুখানি জ্ঞানের-বাতি হাতে ভাবে আমি সূর্য্যের মত জগত আলো করছি। অজ্ঞানের কোলে তার জন্ম, সন্দেহে হাতড়ে হাতড়ে তার চলা, পদে পদে ঠকে ঠকে তিল তিল করে তার জ্ঞান, তবু সে ভাবে 'আমি কি না জানি'। এও ঐ বৃহত্তের খেলা,—সেই বিরাট জ্ঞানময় পুরুষের জমিদারী চালায় বলে মনরূপ নায়েবেরও এত পাক্কা সওয়ার

আশা সোঁটার ঠাট, এত ঐশ্বর্য্য পিছনে থেকে ত্রিকালদর্শী জ্ঞানসূর্য্য তুমি, এই মনবিম্বে আপন ঐশ্চর্য্য প্রকাশ করতে চাইছ বলেই এরএত জ্যোতি।

এ জগতে সবাই মরে অথচ শমনের দূত এসে কেশাগ্র না ধরা অবধি সবাই ঘর বাঁধে, ধনরত্ন জমায়, তিল তিল করে বিলাস-স্বর্গের সিঁড়ি গড়ে, কারণ তার অন্তর-পুরুষ ভাবে সে অমর। মরণের কথা তাকে শুনে শিখতে হয়, অনেক দেখে বুঝতে হয়, তবু স্মরণ থাকে না। ত্রিকালজয়ীর মহাশঙ্খ সদাই তার বুকের মাঝে দিক কাঁপিয়ে বাজছে,

"কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম
আমি আছি রব উঠে অবিরাম"—

এ উর্দ্ধের ধ্রুব লোকের অমৃতত্বের বাণী তার জড় মরণধর্ম্মী দেহের মাটিকেও অমর করতে চায়।

নিজের সত্তার যে দিকে দেখ এই ট্র্যাজেডি, স্বর্গের এই অসমাপ্ত সিঁড়ি, ফাটা বাঁশীতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বাজাবার এই বেদনা। এ সব দেখে বেশ বোঝা যায় আজ যা' হয় নি একদিন তা' হবে কারণ ক্রমে বীণায় সুর বেঁধে আসছে অসমাপ্ত আরোহণীর স্বর্ণ পৈঁঠাগুলি একে একে স্বর্গের দুয়ার অভিমুখে গড়ে উঠছে, মানুষ ক্রমশই তার আপন অন্তরের বেগেই দু'কূল ভেঙে বিপুল কুলহারা হচ্ছে। তার পরম সত্তার সংকল্প হচ্ছে, অমোঘ সিদ্ধ সংকল্প, বাহিরের মন প্রাণ দেহ সেই ব্রহ্মার হাতের নরম মাটি, একদিন সেই মাটি দিয়ে দেবতার রূপ গড়ে উঠবেই উঠবে।